উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

শারদীয় সংখ্যা
১৩৮৬

EBk 3/45

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। *পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত* দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা :—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥০টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

কয়েকখানি নিত্যসঙ্গী বই :

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫৲ টাকা; প্রতি খণ্ড—১৪৲ টাকা। সুলভ সংস্করণ সেট ১০০৲ টাকা; প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম খণ্ড): ১ম ভাগ ১৯.০০, ২য় ভাগ ১৭.০০। সাধারণ: ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭.৮০, ৩য় খণ্ড ৫.২০, ৪র্থ খণ্ড ৭.০০, ৫ম খণ্ড ৭.৫০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। ২৬৲ টাকা

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। ১৭৲ টাকা

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—প্রথম ভাগ ৭৲ টাকা; ২য় ভাগ ১০.০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।
১ম ভাগ ১১৲ টাকা; ২য় ভাগ ১১.০০ টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.০০ টাকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত ৭.৮০ টাকা

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত। ৬·৪০ টাকা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

গ্রামো সাইকেল ষ্টোরস্

২১এ, আর. জি. কর রোড,
শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪

ফোন: ৫৫-৭১৩২
৫৫-৭১৩৩

গ্রাম: গ্রামোসাইকেল

উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৮৬

সূচীপত্র

যোগক্ষেম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের জীবনালেখ্য, স্মৃতিকথা, বাণী ও পত্রাবলীর একটি সংকলন। পূজনীয় স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী সম্বলিত।

মূল্য—১২ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান :

বেলুড় মঠ (পো-কম), উদ্বোধন কার্যালয়, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির—জয়রামবাটী, শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, কামারপুকুর, রামকৃষ্ণ মিশন ইনিস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—বারাণসী, শিলচর, কাটিহার প্রভৃতি।

প্রকাশিকা—শ্রীপুরবী মুখোপাধ্যায়

১৫ বণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯।

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও: বইটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬
সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই, মূল্য—২০৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ: অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। ...মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী নারী এযুগে বিরল।

মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই—১৪৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা: বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরীমা তাহার জীবন্ত উদাহরণ।

ষষ্ঠ মুদ্রণ—৮৲

সাধনা

দেশ: সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা ...প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক...সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সপ্তম সংস্করণ—১৪৲

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা। তৃতীয় মুদ্রণ—৪৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪
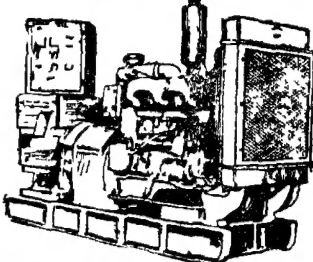
LOAD SHEDDING
OR
POWER CRISIS?
INSTALL
VINEYLITE
KIRLOSKAR & CUMMINS
Generating Sets
leaders in technology for Power Generation

Available in 1 KVA to 1500 KVA AC Single/three Phase 220/440 volts with control panels.

WESTERN INDIA MACHINERY COMPANY
24, Ganesh Ch. Avenue, Calcutta-13.
Phone: 23-5011, 22-6463
Gram: DHINGRASON
Telex: 021-2675 (DHINGRA)
Branch: Delhi Ph. 52-0178

AUTHORISED D E A S. FOR KIRLOSKAR & CUMMINS ENGINES

Kirloskar & Cummins — Way ahead in the race for power.

বেনারসী
সিল্ক
সাড়ী
পোষাক
শৈললাল মণিলাল
স্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২
বহুবাজার
৩৫-৮৬৩৭
কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারী

এন্টিব্যাক্ট্রিন
কার্বাঙ্কল কিওর (রেজিঃ)
কার্বাঙ্কল, শোষ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া বা
পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল
লাগাইলেই সারিয়া যায়।
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি
লিটন এণ্ড কোং কলিঃ-১৩
Antibactrin
IT CUTS
IT CLEANSES
IT CURES

আপনি কি ডায়াবেটিক

তা'হলেও, সুস্বাদু মিষ্টান্ন আস্বাদনের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন কেন ?

ডায়াবেটিকদের জন্য প্রস্তুত

*রসগোল্লা *রসোমালাই

*সন্দেশ প্রভৃতি

কে. সি. দাশের

এসপ্ল্যানেডের দোকানে সব সময় পাওয়া যায়।

১১, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩-৫১২০

Phone { H.O. : 34-4663 / Branch : 35-0959

Senco Jewellery Stores (P) Ltd.

Manufacturing Jewellers & Order Suppliers

187, Bepin Behari Ganguly Street, CALCUTTA-12

Branch :

92C, Bepin Behari Ganguly Street, CALCUTTA-12

With best compliments of

CHOUDHURY & CO.,

Manufacturers & Mine-owners of Lime & Limestone

67/45, Strand Road, Cal-700070

Phone : 33-2850, 33-9056

With best Compliments from :

Forward Engineering Syndicate

Underground Belgachia Section Tuberail Project,

204/1B, Linton Street, Calcutta-14

Phone : 44-6355, 44-7540, 44-9094

শ্রীশ্রীদুর্গার রঙিন চিত্রটি শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত।

মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুন

যদি সন্তানদের শিক্ষা, তাদের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে আপনিও অবশ্যই মানসিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারবেন।

একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই মানসিক শান্তি আসে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ দুই-ই পেতে পারবেন।

স্থাপিত—১৯৩২

দি পিয়ারলেস জেনারেল

ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিমিটেড
(পূর্বতন দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেন্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ)

রেজিষ্টার্ড অফিস : "পিয়ারলেস ভবন",
৩, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা—৭০০০৬৯

সার্টিফিকেট হোল্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ১ ভাগেরও বেশী টাকা ট্রাষ্টী ও গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক

রোগীর আরোগ্য এবং ডাক্তারের সুনাম নির্ভর করে বিশুদ্ধ ঔষধের উপর। আমাদের প্রতিষ্ঠান সুপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি ঔষধ পাইতে হইলে আমাদের নিকট আসুন।

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক। বহু মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুর্বিংশ (২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৫·০০ টাকা মাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বহু পুস্তক পাঠেও তাহা হইবে না। আজই একখণ্ড সংগ্রহ করুন। নকল হইতে সাবধান। আমাদের প্রকাশিত পুস্তক যত্নপূর্বক দেখিয়া লইবেন।

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও পাওয়া যায়। মূল্য টাঃ ৬·৫০ মাত্র।

বহু ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ক্যাটালগ দেখুন।

ধর্মপুস্তক

গীতা ও চণ্ডী (কেবল মূল)—পাঠের জন্য বড় অক্ষরে ছাপা। মূল্য ৬·০০ টাকা হিসাবে।

স্তোত্রাবলী—বাছাই করা বৈদিক শান্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। অতি সুন্দর সংগ্রহ, প্রতি গৃহে রাখার মত। ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য টাঃ ৪·৫০ মাত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডী—একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১৫·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

Tels—HOMEOCURE হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস এণ্ড পাবলিশার্স Phone: 22-2536

৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
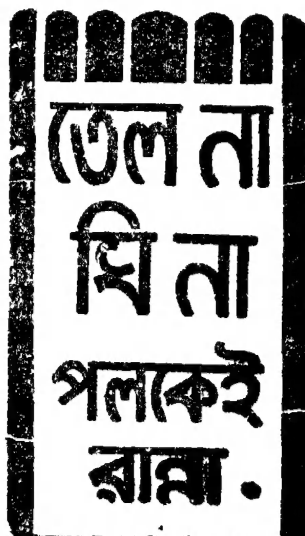
for Latest and Best

in

HAKOBA

Embroidered Sarees

Petty-coats

Cut Cambrics

&

Laces

Visit—

QUEENI,

109, Netaji Subhas Road.

শতাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতায়…
অক্ষয় কুমার লাহা
রং
WHITE PAINT
১-ধর্ম্মতলা স্ট্রীট কলি
PHONE: 23 2765 GRAM COLOURMAN

With Compliments of :—

Phone : 23-9546

Gram : KHARIMATI

Patelnagar Minerals & Industries Private Ltd.

2, CHURCH LANE, CALCUTTA-700001

Mine Owners of :
CHINA-CLAY, FIRE-CLAY
(LUMP & POWDER)

Mines & Refinery :
PATELNAGAR, BIRBHUM.
Phone : Md Bazar, 23,24,25
(Via SURI)

With Best Compliments :

Machine Parts Mfg. Co.

Tea-Machinery Parts Manufacturers
83, HARI GHOSE STREET, CALCUTTA-700006
Phone : 55-4768

WE SELL THE BEST

1. Philips Radios & Transistors
2. Phio Players & Stereos
3. HMV Players & Stereos
4. HMV Records
5. Philips Intercom System
6. EVEREADY Batteries
7. Philips Amplifiers, Microphones etc etc
8. Cinevista T V's
9. Sonodyn T. V. etc. etc.

G. ROGERS & CO.

Branch . H O. : 12, DALHOUSIE SQ. EAST, CALCUTTA-1 23-5483
51, SHAKESPEARE SARANI, CALCUTTA-17 44-0779

তোমরা আহারের দ্বারা শরীরের পুষ্টি করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার? তোমরা অধ্যয়নাদির দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার?

—স্বামী বিবেকানন্দ

আমবাড়ী গ্রুপের 'চা'—
'স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে অতুলনীয়'—

আমবাড়ী টি কোম্পানী লিঃ

১৮৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০২৯
ফোন: ৪২-১৫৩৪, ৪২-১৬৩৪

K. P. BASU PUBLISHING CO.

42, BIDHAN SARANI, CALCUTTA

পুস্তক তালিকা :— Phone : 34-1100

১। সহজ আধুনিক গণিত (সপ্তম শ্রেণী)—কে. পি. বসু
২। সহজ আধুনিক গণিত (অষ্টম শ্রেণী)—কে. পি. বসু
৩। সহজ আধুনিক গণিত [নবম শ্রেণী—১ম খণ্ড (বীজগণিত—পাটীগণিত)]—কে. পি. বসু
৪। সহজ আধুনিক গণিত [নবম শ্রেণী—২য় খণ্ড (জ্যামিতি—পরিমিতি)]—কে. পি. বসু
৫। সহজ আধুনিক গণিত [দশম শ্রেণী—১ম খণ্ড (বীজগণিত—পাটীগণিত)]—কে. পি. বসু
৬। সহজ আধুনিক গণিত [দশম শ্রেণী—২য় খণ্ড (জ্যামিতি—পরিমিতি—ত্রিকোণোমিতি)]—কে. পি. বসু
৭। ভারতের ভূগোল (অষ্টম শ্রেণী)—ডঃ সত্যেশ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক সুনীল মুন্সী
৮। ভারতের ভূগোল—(নবম শ্রেণী)—ডঃ সত্যেশ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক সুনীল মুন্সী
৯। ভারতের ভূগোল (দশম শ্রেণী)—ডঃ সত্যেশ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক সুনীল মুন্সী
১০। মধ্যশিক্ষা অতিরিক্ত গণিত (নবম-দশম শ্রেণী)—কে. পি. বসু

যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন ও করছেন তাঁদের সকলকেই 'শারদীয় অভিনন্দন জানাই'।

বি. কে. সাহা এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

বিখ্যাত চা ব্যবসায়ী

স্থাপিত ১৯২২

৫ নং পলক স্ট্রীট

কলিকাতা-১

ফোন : ২৬-২৪০৩

বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল, তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।

ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

Phone : 24-7668

D. D. MEDICAL STORES

DISPENSING CHEMISTS & DRUGGISTS

157-B, DHARAMTOLLA STREET,

CALCUTTA-13.

LAXMI SALES AGENCY

22/3A, Roy Street, Cal-20,

Main Dealer—Selsar Marketing Ltd.

SELSAR MARKETING LTD.

"Time and talent build up a reputation, such is the story of EDUCATION EMPORIUM started in 1954 as a smallest unit for manufacturing Scientific Instruments and now the biggest Enterprise of its kind in EASTERN INDIA, yet still growing".

ON THE APPROVED LIST OF D.G.S. & D (NEW DELHI)

EDUCATION EMPORIUM

Manufacturers :

'JANTRAM Brand Scientific & Technical Instruments & THERMOPOWER'

Gas Plant

26, COLLEGE STREET, CALCUTTA-12

PHONE : 34-1949

Phone 27-3793

Mritunjoy Stores

Liquid Soap, Disinfectants, Insecticides

and

Miscellaneous Domestic requisites

Stockist of · Swastic Oil Mills Ltd

(Industrial Product Div)

Bayer India Ltd (Public Health Products)

27, CANNING STREET, CALCUTTA-1.

আনন্দময়ীর শুভাগমনের অবসরে

আচার্যবরিষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ স্ব-প্রতিষ্ঠিত

‘উদ্বোধন পত্রিকা’র

প্রচারের মাধ্যমে জন-মানস

তাঁরই ভাবধারার

আকলনে

আনন্দময় হয়ে উঠুক্।

—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাশ্রিত

জনৈক

Tele : ELENTICO Phone . 22-8059

L. N. Trading Co. Private Ltd.

STOCKISTS & ORDER SUPPLIERS,
EVERYTHING ELECTRICALS

Shop
11, Ezra Street,
Calcutta-1

Branch :
12, Rabindra Sarani,
Room No G. 26
Calcutta-1

Phone : 33-5422

Nagendra Nath Ghosh & Co.

HARDWARE MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS,
159, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-1
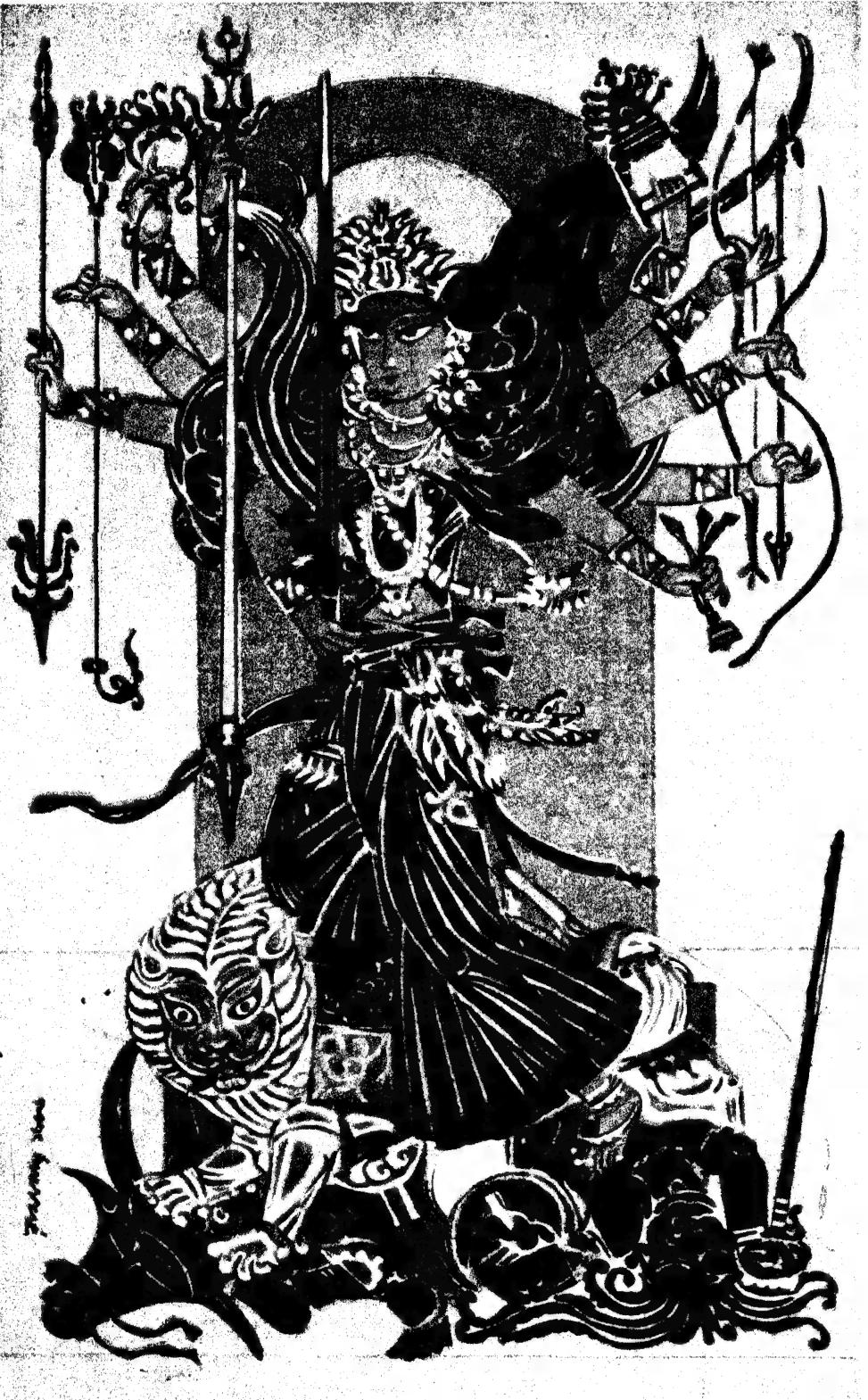
৮১তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৮৬

দিব্য বাণী

মায়ের উন্নত ছেলেরা বলেন "আমাদের মা—এত ছোট মা নয়। আমাদের মা সর্ব্বব্যাপী। তাঁর আবাব আগমন, আবাহন ও বিসর্জ্জন কি? তাঁর আবার চাল কলা দিয়া পূজা কি?"

আমাদের কিন্তু এতে মন ওঠে না। আমাদের মা সব রকমই হতে পারেন। "তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, এবং এ ছাড়া আর কত কি হতে পারেন, তা কে জানে?" তিনি অনন্ত, তাঁহার গুণ অনন্ত. মাহাত্ম্য অনন্ত, রূপও তাঁর অনন্ত। তিনি ভক্ত-বৎসল। অপার তাঁর করুণা। যে ছেলে যেরূপে তাঁকে পেলে আনন্দ পায়, তাঁর নিকট সেই রূপেই প্রকাশিত হন। তিনি না কৃপা ক'রে আমাদের আধার অনুযায়ী প্রকাশিত হলে আমাদের সাধ্য কি, সে অসীম অনন্তের স্বরূপ একেবারে বোধগম্য করি। আমরা যখন বড় হব, আমাদের বুদ্ধি যখন খুব মার্জ্জিত হবে, হৃদয় যখন দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হবে, তখন মা আমাদের নিকট তাঁর অত গম্ভীর ভাব অত উচ্চ অবাঙ্‌মনসোগোচর ভাব ধারণ কর্‌লে, কিছু তত ক্ষতি হবে না। এখন আমরা অতি শিশু,' এখন থেকে যত মাকে আমরা স্বচক্ষে দেখে নেব, ততই আমাদের হৃদয়ে মায়ের ছবি অঙ্কিত হয়ে যেতে থাকবে, ততই মায়ের গুণ, মায়ের ভাব, অন্তরে অন্তরে গেঁথে যেতে থাকবে।

—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

['আনন্দময়ীর আগমন' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ হইতে উদ্ধৃত : উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা (১৫ই আশ্বিন, ১৩০৬)]

কথাপ্রসঙ্গে

শারদীয়া মহাপূজা : তত্ত্ব ও ইতিবৃত্ত

আশ্বিন মাস সমাগত। এই মাসে জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর অর্চনা বাঙলা দেশে মৃন্ময়ী মূর্তিতে মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই পূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব রূপে পরিগণিত, কিন্তু ইহা কেবলমাত্র বাঙলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়, আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের সর্বত্র কোন-না-কোন ভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজার সহিত ভারতের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের একটি ঘটনা যুক্ত আছে। কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র এই শরৎকালীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করিয়া দেবীর বরলাভ করেন এবং রাবণকে নিধন করিয়া সীতার উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। দুর্গাপূজার মন্ত্রেও আছে—'রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।' শ্রীরামচন্দ্র দশমী তিথিতে রাবণকে বধ করেন বলিয়া উহা বিজয়া দশমী নামে উল্লিখিত হয়। পূর্বে শ্রীশ্রীদেবীর পূজা বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হইত। শরৎকালে অসময়ে পূজা করিবার জন্য দেবীকে উদ্বোধিত করিতে হইয়াছিল। সেইজন্যই মন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।' যাহা হউক দেবীর শারদীয়া পূজা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত উৎসব-সমারোহ এই পূজাকে আমাদের দুঃখময় জীবনে স্বল্প সময়ের জন্য হইলেও আনন্দের প্রবাহে পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়।

বঙ্গদেশে এই পূজার উদ্ভব কখন হইতে হইল তাহার পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ষোড়শ শতকে তাহিরপুরের রাজা উদয়নারায়ণের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা হইলে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন এই বলিয়া যে, কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ শাস্ত্রবিহিত নয়। সুতরাং তাহার পরিবর্তে তাঁহারা তাঁহাকে দুর্গাপূজার বিধান দেন, যাহা অশ্বমেধ যজ্ঞের সমতুল্য এবং সমানফলদায়ী হইবে। রাজা উদয়নারায়ণ মনুসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুল্লূক ভট্টের পিতা। তিনি নিজে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পৌত্র রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে দেবীর পূজাপদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহিরপুরের রাজ-পণ্ডিত শ্রীরমেশ শাস্ত্রী দুর্গাপূজাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন বলিয়া কথিত আছে। এই পদ্ধতি সাধারণ তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি নয়। এই পদ্ধতিতে বহু বৈদিক মন্ত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূজার ক্রমে কল্পারম্ভ, অধিবাস, ঘটস্থাপন প্রভৃতি বহু ব্যাপারেই বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। লক্ষণীয় এই সমস্ত মন্ত্র প্রধানতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের মন্ত্র হইতে আহৃত। মনে হয়, দুর্গাপূজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই এই সমস্ত মন্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল। তবে এই সব মন্ত্র যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে বিষয়ে মন্ত্রটির প্রয়োগ তাহার সহিত মন্ত্রের কোন সংগতি নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, দধি দিয়া অধিবাস করিবার

সময় যে মন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়, সেটির সঙ্গে দধির কোন সম্পর্ক নাই। এই মন্ত্রটি শুক্ল-যজুর্বেদের অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানপত্নী এবং পুরোহিতগণের অশ্লীল কথোপকথনের পর মুখ পবিত্র করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত—'দধিক্রাব্‌ণোঽকারিষম্' বলিয়া এই মন্ত্রের আরম্ভ। 'দধিক্রাবণ্' কিন্তু একটি দেবতার নাম। অনুরূপভাবে সিন্দুরের সহিত সিন্ধুর ধ্বনিসাদৃশ্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ সম্পর্ক না থাকিলেও সিন্দুরের দ্বারা অধিবাসের সময়ে 'সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো' ইত্যাদি মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া চলে। মনে হয়, বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের বৈদিক ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতাই নানা মন্ত্রের নানাস্থানে এইরূপ প্রয়োগের হেতু।

যাহা হউক, দুর্গাপূজার অধিবাস, মহাস্নান প্রভৃতি অঙ্গের মন্ত্রমাধুর্য সমগ্র পূজাকে একটি ভাবগম্ভীর এবং ভক্তিরসাপ্লুত চরিত্র দান করিয়াছে। এই মহাপূজায় নবপত্রিকাপূজা একটি প্রধান অঙ্গ। বর্ষা অতিক্রান্ত, শরতের অভ্যাগম হইয়াছে। ইহাই দেবী দশভুজার পূজার সময়। এই সময়ে ধরণী শস্যশ্যামলা—নানা শস্য বর্ষার বারিধারায় উৎপন্ন হইয়াছে। দেবী অনেক স্থলে কৃষিদেবতা রূপে উল্লেখিত। সেইজন্যই শারদীয়া এই পূজাতে নয়টি উদ্ভিদের পূজার বিধানও দেওয়া হইয়াছে—নবপত্রিকা পূজা বলিয়া। এই নবপত্রিকায় রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মান এবং ধান্য—এইগুলিকে একত্রিত করিয়া নারীরূপে সজ্জিত করিয়া দেবীর অপর রূপ হিসাবে পূজা করা হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি বৃক্ষেরই এক-একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী কল্পনা করিয়া তাঁহাদের পূজা করা হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমস্ত দেবীর একীভূত রূপেও পূজা করা হইয়া থাকে।

বাঙলা দেশের পূজায় ভক্তির সহিত স্নেহ-মিশ্রিত হইয়া ইহাকে একটি অপরূপ ভাব-সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে। দেবীর নিবাস কৈলাসে। সেখান হইতে তিনি বৎসরে তিন দিনের জন্য হিমাচলশিখরে বঙ্গভূমিতে সপরিবারে আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশ। তাঁহাদের লইয়া তিনি পিতৃগৃহে আসেন। এই আগমনের দিনকয়টি সেইজন্য আনন্দের পরিপ্লাবনে ভাসিয়া চলে। পূজার কিছুদিন পূর্ব হইতে গায়কগণের সঙ্গীতের ভিতর দিয়া স্নেহ-আকুতিতে বঙ্গবাসীর প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। হিমালয়দয়িতা মেনকার হৃদয়ের ভাবরস সকলের হৃদয়ে রূপ পরিগ্রহ করে। সেইজন্যই আগমনী গানের ভিতর দিয়া দেবীর আহ্বান আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়। গায়ক গাহিতে থাকেন,—

'গিরি! প্রাণগৌরী আন আমার।
উমা-বিধুমুখ　　　না দেখি বারেক
এঘর লাগে আঁধার॥'

এই বাৎসল্যভাবই বাঙলাদেশের পূজার স্থায়ী সুর।

শাস্ত্রে আছে, 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'—সাধকদের হিতের জন্য ব্রহ্মের নানা প্রকার রূপ পরিকল্পিত হয়। সুতরাং এই রূপ-পরিকল্পনার পিছনে, এই বাহ্যপূজার পশ্চাৎপটরূপে একটি দার্শনিক তত্ত্ব উপনিহিত রহিয়াছে। সেই তত্ত্ব লইয়া বিচার করিলে তবেই বাহ্যপূজার প্রয়োজন, উপযোগিতা এবং ফল সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা জন্মিতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্বের আলোচনায় পূর্বে আমাদের প্রয়োজন দেবীপূজার উদ্ভব এবং

প্রচলনের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা ধারণা পাইবার চেষ্টা করা।

সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মাতৃদেবতার পূজা অতি প্রাচীন এবং ব্যাপক। জগতের প্রায় সর্বত্র উহার প্রচলন ছিল। প্রাচীনকালে এলাম, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশে স্ত্রীদেবতার পূজার প্রথা প্রচলিত ছিল ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরাপ্পা সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় বহু স্ত্রীমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি স্ত্রীদেবতার মূর্তি বলিয়া অনুমিত হয়। ইজিপ্ট, গ্রীস, ইরান এবং প্রাগৈতিহাসিক মেক্সিকোতেও মাতৃদেবতার পূজা হইত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

ভারতের ইতিহাসে কালনির্ণয় কঠিন ব্যাপার। মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরাপ্পার সভ্যতা বেদপর বা বেদপূর্ব এখনও পণ্ডিতগণ তাহা স্থির করিয়া বলিবার কোন প্রমাণ পান নাই, যদিও অধিকাংশ পাশ্চাত্য এবং তদ্‌ভাবভাবিত ভারতবর্ষের পণ্ডিতদের মতে ঐ সভ্যতা বেদপূর্বই ছিল। কিন্তু বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। বেদেরও কাল নির্ণয় লইয়া বিভিন্ন মত রহিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিংশ শতক পর্যন্ত বেদের কাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যদি খৃষ্টপূর্ব তিন সহস্র বৎসরকে বেদের কাল বলা হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতগণের দ্বারা মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার যে কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহা তাহার পূর্বেই। সুতরাং বৈদিক যুগ যে মহেঞ্জোদাড়ো-হরাপ্পা সভ্যতা-যুগের পূর্বেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। যাহা হউক সমস্যা নির্ণয়ের কুহেলিকা পরিত্যাগ করিয়া আমরা বৈদিক সভ্যতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই যে, সেখানে বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। সেইজন্য বহু পণ্ডিতই বৈদিক যুগের মনুষ্যদিগকে বহুদেববাদী (Polytheist) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলার এই মতকে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে বৈদিক দেবতার উপাসনার একটি বিশেষত্ব হইল যে, উপাসকগণ বহু দেবতাকে উপাসনা করিলেও যখনই যে দেবতার উপাসনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই সর্বোচ্চ দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাকে তিনি এক ধরনের একেশ্বরবাদ বলিয়াছেন এবং ইহার নাম দিয়াছেন 'হেনোথিজম্' (Henotheism)। বৈদিক সংহিতাভাগ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যে আপাতপ্রতীয়মান বহুদেববাদ হইতে আরম্ভ করিয়া একেশ্বরবাদ এবং অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সমস্ত অধ্যাত্মদৃষ্টির সমাবেশ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আমাদের প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক সমাজে কেবলমাত্র যে পুরুষ-দেবতারই উপাসনা হইত, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীদেবতারও উপাসনা করিয়াছেন। কিন্তু এই উপাসনার ভিতর দিয়া তাঁহারা একটি অপূর্ব তত্ত্বে গিয়া পৌঁছাইয়াছেন, যে তত্ত্ব পরের যুগে পুরাণ এবং তন্ত্র নানা উপাখ্যান, প্রতীক ও প্রতিমার মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়া মানবসাধারণের নিকট একটি সহজবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য আলম্বন রূপে উপস্থাপিত করিয়াছে। বেদের এই তত্ত্বের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব একটি শক্তির প্রকাশ বলিয়া অনুভূত এবং প্রবেদিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্তে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ পরাশক্তির স্তব করিয়াছেন এবং নিজেকে

সেই পরাশক্তির অংশ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। তিনি সেই সূক্তের দুইটি ঋকে বলিতেছেন :

মযা সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥

অর্থাৎ, আমারই শক্তিতে সকলে আহার ও দর্শন করে, সকলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, শব্দাদি বিষয় শ্রবণ করে, আমাকে যাহারা এইভাবে জানে না তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হে কীর্তিমান, শ্রবণ কর, শ্রদ্ধালভ্য এই বস্তু তোমাকে বলিতেছি। দেবগণ এবং মনুষ্যগণ কর্তৃক সেবিত এই বিষয় আমি নিজেই বলিতেছি, আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকে শ্রেষ্ঠ করি,—তাহাকে ব্রহ্মা, তাহাকে ঋষি, তাহাকে প্রজ্ঞাশালী করি।

উক্ত সূক্তের শেষ দুইটি ঋকে অম্ভৃণ-কন্যা ঋষি বাক্ বলিতেছেন :

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥

অহমেব বাত ইব প্র বাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সং বভূব ॥

অর্থাৎ, আমি উপরিস্থিত পিতাকে (আকাশকে) প্রসব করিয়াছি। বুদ্ধিমধ্যস্থ যে ব্রহ্মচৈতন্য উহাই আমার কারণ। সুতরাং আমি সমস্ত বিশ্বভুবনে বর্তমান আছি। অধিকন্তু ঐ স্বর্গকে দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি। আমি সমস্ত ভুবন সৃষ্টি করিয়া বায়ুর ন্যায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করি। এই আকাশ ও পৃথিবীর অতীত হইয়াও—অসঙ্গ-ব্রহ্ম-স্বরূপিণী হইয়াও—আমি নিজ মহিমায় এই জগদ্রূপে অভিব্যক্ত রহিয়াছি।

এই যে শক্তিতত্ত্ব, ইহা পৃথিবীর চিন্তা-রাজ্যে সম্পূর্ণ নূতন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৭তম সূক্ত যাহা রাত্রিসূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার ভিতরেও এই শক্তিতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে।

বৈদিক সংহিতাযুগের পরে আমরা যখন ঔপনিষদিক যুগে আসিয়া পৌছাই, তখন কেনোপনিষদে উমা হৈমবতীর উপাখ্যানে আমরা আবার ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদের একটি মন্ত্রে 'দুর্গা' শব্দের উল্লেখ পাইতেছি। সেই মন্ত্রটি এই :

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ ॥

—আমি সেই সূর্যোদ্ভবা, অগ্নিবর্ণা, তপস্যার দ্বারা দেদীপ্যমানা, কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করি। হে ত্রাণকারিণি! আমাকে তুমি ত্রাণ কর, তোমাকে নমস্কার।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাগায়ত্রীও উদ্ধৃত হইয়াছে, 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।' ভাষ্যকার সায়নাচার্যের মতে দুর্গা ও দুর্গি শব্দ অভিন্ন।

এই শক্তিবাদ বেদের চিন্তাতরঙ্গিণীরই

একটি শাখা হইলেও বৈদিক তন্ত্রে ইহা বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। বৈদিক তত্ত্বের মূল-কথা হইল—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। মানুষের অজ্ঞান হইতে এই মিথ্যা জগতের অনুভূতি। ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গিয়া সগুণ ঈশ্বর এবং তাঁহার মায়াশক্তি স্বীকার করিলেও পরমার্থতঃ ঐ ঈশ্বর বা মায়ার কোন প্রকৃত সত্তা নাই, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত। সুতরাং ব্রহ্মানুভূতি হইলে শক্তির যে কোন অস্তিত্ব থাকে না, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় অদ্বৈতবেদান্তের মতানুসারে বোঝা অতীব দুরূহ। সেইজন্যই পুরাণ-তন্ত্রাদিমুখে একটি বিশিষ্ট দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল, যে দর্শনে শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার শক্তির সাহায্যেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় করিয়া থাকেন। তন্ত্রে এই ঈশ্বর এবং তাঁহার শক্তিকে বলা হইয়াছে শিব এবং শক্তি। শিব নিষ্ক্রিয়। তিনি সর্বদাই অহং-বোধে মগ্ন। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাভূমিরূপে গ্রহণ করিয়া শক্তি এই সমগ্র জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইহার পরিপালন করেন এবং ইহার সংহারও তিনিই করিয়া থাকেন। এই শক্তি নানা রূপে এবং নানা নামে সাধকদের দ্বারা পরিকল্পিত। কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী—একই শক্তির বিভিন্ন ভাব ও প্রকাশ।

এই দেবীর কথা পুরাণে নানা ভাবে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত, দেবী পুরাণ প্রভৃতিতে এই দেবীর সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব এবং নানা আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। এই সকল আখ্যায়িকা এবং তত্ত্বের মধ্য দিয়া এবং তান্ত্রিক তত্ত্বদর্শনের মাধ্যমে আমরা বুঝিতে পারি যে, শিব-শক্ত্যাত্মক এই জগতে দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ, বেদনা, বন্ধন প্রভৃতি আমাদেরই কর্মফল এবং এই কর্মফল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে দেবীর উপাসনা প্রয়োজন। তাঁহার কৃপার প্রয়োজন। আমরা দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। শ্রীদুর্গা সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'দেবীমাহাত্ম্যে' বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই 'দেবীমাহাত্ম্যে'রই অপর নাম 'দুর্গাসপ্তশতী' বা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'। এই 'দেবীমাহাত্ম্যে' বলা হইয়াছে, সুরথ নামে এক রাজা শত্রু কর্তৃক নির্জিত হইয়া গহন বনে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি মেধাঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দ্বারা সৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই সময়েও তিনি তাঁহার সমস্ত সাংসারিক বিষয়ের কথা ভুলিতে পারিতেছিলেন না। পুনঃ পুনঃ বিষয়-চিন্তা দ্বারা ক্লিষ্ট রাজা সুরথ সেই স্থানে সমাধি নামে একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে। তাহাতে সেই বৈশ্য নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার অসাধু স্ত্রীপুত্রগণ ধনলোভে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাঁহার মন তাহাদের সম্পর্কেই চিন্তা করিতেছে। নিষ্ঠুর সংসারের প্রতি এইরূপ অহেতুক আকর্ষণ কেন?—ইহা জানিবার জন্য সমাধিসহ সুরথ মেধাঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার উত্তরে মুনি বলিলেন:

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥

অর্থাৎ সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদেরও চিত্ত বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করেন। এই চরাচর জগৎ তিনি সৃষ্টি করেন। তিনি প্রসন্না হইলে নরগণের মুক্তির নিমিত্ত বরদা হন। তিনি সংসারমুক্তির হেতুভূতা পরমা বিদ্যা ও সনাতনী। তিনিই সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।

তখন সুরথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ ব্রবীতি।'—'হে ভগবন্! সেই দেবী যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কে?' উত্তরে ঋষি বলিলেন:

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥

—'সেই মহামায়া নিত্যা এবং বিশ্বরূপা, তাঁহার দ্বারাই এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত। তাহা হইলেও তাঁহার আবির্ভাব বহু প্রকারে হইয়াছে; তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।' এই বলিয়া মেধাঋষি যোগনিদ্রারূপে বিষ্ণুর নেত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতা দেবী যেভাবে ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুর প্রবোধনের জন্য তাঁহার নেত্রাদি হইতে অপসৃত হইলেন এবং যাহার ফলে মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের নিধন সম্ভব হইল, তাহা বর্ণনা করিলেন।

ইহার পরের উপাখ্যানে মেধাঋষি আমরা যে দুর্গাদেবীর পূজার কথা বলিতেছি, তাঁহার উদ্ভবের কথা বলিলেন—

মহিষাসুর যখন দৈত্যগণের রাজা এবং ইন্দ্র দেবরাজ, তখন একশত বৎসর ধরিয়া দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল। সেই সংগ্রামে দেবসৈন্যরা পরাজিত হইলে মহিষাসুর স্বর্গাদিলোক জয় করিয়া নিজেই সমস্ত বিশ্বের অধিপতি হইলেন। তখন পরাজিত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া যেখানে শিব ও বিষ্ণু ছিলেন, সেইখানে গিয়া তাঁহাদের নিকট নিজেদের পরাভবের কথা নিবেদন করিলেন। দেবতাদের দুর্দশার কথা শুনিয়া বিষ্ণুর ক্রোধ হইল, মহাদেবও ক্রোধান্বিত হইলেন। এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের সেই অতি কোপপূর্ণ বদন হইতে মহান্ তেজোরাশি নির্গত হইতে লাগিল। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতার শরীর হইতেও সুমহৎ তেজোরাশি নির্গত ও একত্রে মিলিত হইয়া ত্রিলোকব্যাপিনী এক অপূর্ব তেজোময়ী নারীমূর্তি সৃষ্টি করিল। এই শক্তিরূপিণী দেবী দেবতাগণ কর্তৃক নানা অস্ত্র এবং আভরণে ভূষিতা ও দেবতাদের দ্বারা সম্পূজিতা হইয়া বারংবার অট্টহাস্যের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিলেন। সেই গর্জন শুনিয়া মহিষাসুর—

আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ।
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ ॥

—'আঃ একি! ক্রোধের সহিত এই কথা বলিয়া মহিষাসুর অসংখ্য অসুরের সহিত ঐ শব্দাভিমুখে ধাবিত হইল।' ইহার পর মহিষাসুর এবং তাহার সৈন্যদের সহিত দেবীর তুমুল যুদ্ধ হইল এবং মহিষাসুরের সমস্ত সৈন্য সংহার করিয়া দেবী মহা অসির দ্বারা মহিষাসুরের মস্তক ছিন্ন করিলেন। এই ভাবে দেবী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গারূপে সম্পূজিতা হইলেন।

ইহার পর মেধাঋষি আর একটি উপাখ্যানে দেবতাদের পুনরায় শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয়ের দ্বারা নির্জিত হওয়ার কথা এবং কিভাবে দেবী দেবতাগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া উহাদের সংহার করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন।

পরিশেষে সুরথ ও সমাধি মেধাঋষি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নদীপুলিনে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া তিন বৎসর কঠোর তপস্যা, সংযম ও একাগ্রতার সহিত দেবীর পূজা করিলেন। পূজার ফলে দেবী সন্তুষ্টা হইলেন এবং রাজাকে পুনরায় রাজ্যলাভের বর এবং বৈরাগ্যবান বৈশ্য সমাধিকে তত্ত্বজ্ঞান-লাভের বর প্রদান করিলেন।

অসুরাধিপতি শুম্ভ নিহত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবীকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা 'নারায়ণীস্তুতি' নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত স্তবে প্রসন্না হইয়া দেবী বলিয়াছিলেন :

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

অর্থাৎ, এই রকম যখন যখন দানবদের দ্বারা উদ্ভূত বিপদ উপস্থিত হইবে, তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া শত্রুগণের নিধন করিব।

এই যে শত্রু, এ শত্রুর সহিত সংগ্রাম ও তাহার নিধন কোন বাস্তব ঘটনা বলিয়া মনে করার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেহে ও মনে নিরন্তর যে দেবাসুর-সংগ্রাম চলিয়াছে, ইহা তাহারই রূপক। মোহরূপ মধুকৈটভ, ক্রোধরূপ মহিষাসুর, কামরূপ শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবীর প্রসাদে নির্জিত হইয়া থাকে এবং দেবী প্রসাদসুমুখী, তিনি পূজিতা হইয়া আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ বিধানের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। ইহাই সুরথ এবং সমাধির উপাখ্যানে পরিকীর্তিত। আমাদের এই দুর্গাপূজা উক্ত উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমাদের পূজা সত্ত্বেও দেবী যেন আমাদের প্রতি প্রসন্না নন। ইহার কারণ কি? আমরা পূজা করি বটে, কিন্তু সে পূজা ভক্তির সহিত পূজা নয়। সে পূজা পূজার নামে যথেচ্ছাচার। সেই-জন্যই দেবী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না নন। এই কথাটি পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ তাঁহার 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন। নিম্নে উক্ত গ্রন্থ হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিতেছি—

'অন্য দেশে মা শতহস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তস্তল জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তানসকলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, আচ্ছাদন-বিরহিত, রোগে জর্জরিত তোমার সন্তানসকলের তুলনা করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শত দোষে দোষী কর। অন্যের পদাঘাত-পীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক। কিন্তু দোষ কাহার? দেখিতেছ না, তাহারা অজ্ঞানসময়ে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে, আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চিন্ত আছ। উহারা বিদ্যারূপিণী শক্তির পূজায় অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজস্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্য আত্মবলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে, আর তুমি অবিদ্যাসেবায় যথাসর্বস্ব পণ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসুখ লইয়া বসিয়া আছ। জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন? শাস্ত্র যে তোমায় বার বার বলিতেছেন, তিনি বলিপ্রিয়া, রুধিরপ্রিয়া। দেবীর ঐ ভাব যে তাঁহার ধ্যানমন্ত্রেই রহিয়াছে। ঐ শুন ভারতের তন্ত্রকার তোমায় কিভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন—

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্।

মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥

'প্রতিকার্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্বার্থসুখ ত্যাগে আত্মবলিদানে তাঁহার তর্পণ কর। তাঁহাকে প্রসন্ন কর, দেখিবে শক্তিরূপিণী জগদম্বা তোমারও প্রতি পুনরায় ফিরিয়া চাহিবেন। তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে অদম্য উৎসাহরূপে প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে জগন্মাতার নিত্য সহচরীদল—বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি, মেধা প্রভৃতি' আবার তোমার উপর প্রসন্না হইয়া প্রতি কার্যে তোমার সহায়তা করিবেন।'

এই মহাপুরুষ-বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমরা যেন ভক্তিনম্র চিত্তে মাকে মা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া যথাযথভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে পারি, ইহাই শারদীয়া মহাপূজার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা।

মন্ত্রধ্বনি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

বহুসুকৃতিফলে সদ্‌গুরুর নিকট সিদ্ধমন্ত্র ও সাধনোপদেশ-লাভ হইলে সাধককে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লইয়া ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে দিনের পর দিন মন্ত্রসাধনা করিয়া যাইতে হয়। করে বা মালায় বা মনে মনে জপ করা চলে। শাস্ত্র ও মহাপুরুষরা বলিয়াছেন মন্ত্র ইষ্টের শব্দ-রূপ। মন্ত্রসাধনা দ্বারা ইষ্টের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি আবার শব্দব্রহ্ম। মন্ত্রকে শব্দব্রহ্ম জানিয়া অবিচলিত বিশ্বাস ও প্রীতি জাগাইয়া জপ চালাইয়া যাইতে যাইতে ধীরে ধীরে মন্ত্র জাগিয়া উঠেন। মন্ত্রধ্বনির সহিত সচ্চিদানন্দ ইষ্ট প্রতিভাত হইতে থাকেন। মন গহন অস্তিত্বে স্থিতিলাভ করে, চৈতন্যালোক হৃদয়কে আলোকিত করে, অপূর্ব আনন্দ ও শান্তিতে অন্তর ভরিয়া যায়। যে ভগবান শুধু কথার কথা ছিলেন তিনি অসন্দিগ্ধ সত্যরূপে সাধকের কাছে ধরা দেন। প্রচলিত সন্তোপদেশ—জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন:

> 'জপ থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন।'
>
> (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।২১।৫)
>
> 'জপ করা কিনা নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। এক মনে নাম করতে করতে তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়ি-কাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবানো আছে, শিকলের আর এক দিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক একটি কড়া ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ কড়িকাঠ স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।'
>
> (ঐ ৪।২৮।১)

ভগবদনুভূতি দুই ভাবে সাধকের নিকট আসে—সাকার এবং নিরাকার। কোনও

কোনও সাধক উপাসনার সময়ে মূর্তিচিন্তার প্রতি অনুরাগী। জপের সঙ্গে সঙ্গে এবং জপের পরে বা আগে তাঁহারা হৃদয়কমলে ইষ্ট-মূর্তিকে স্থাপন করিয়া সেই মূর্তিকে স্মরণ করেন। আচার্যেরা বলেন মন্ত্রজপ নিবিষ্টতা লাভ করিলে সেই মূর্তি একদিন বাস্তবিকই জীবন্ত বলিয়া অনুভব হয়। অন্তরে এই মূর্তি-দর্শনের ফলে সাধকের শান্তি ও আনন্দের, পরিসীমা থাকে না। এইরূপ দর্শন যাঁহার উপস্থিত হয় তিনি সত্যই অতি ভাগ্যবান। মূর্তির দর্শন যে প্রতিদিনই ঘটিবে তাহা বলা চলে না। উহার প্রয়োজনও নাই। একবার দর্শনের ফলও অতি প্রগাঢ়। সাধকের বিশ্বাস ভক্তি অত্যন্ত দৃঢ়তা লাভ করে। ঐ দর্শন তাঁহার চরিত্রকে রূপান্তরিত করে। ভগবান যে অন্তরে রহিয়াছেন, তিনি যে অনন্তকালের পিতা, মাতা, পাতা, বন্ধু—এই ভাবটি মনে সর্বদা জাগ্রত থাকে। শ্রীভগবান সম্বন্ধে সংশয় চলিয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, বিনয়, মৃদুতা, প্রেম উত্তরোত্তর প্রকাশ পাইতে থাকে।

যে সাধক শ্রীভগবানের নিরাকার ভাবের প্রতি আকৃষ্ট, তিনি অন্তরে বাহিরে সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করেন। সদ্‌গুরু তাঁহাকে ঐ ভাব অনুযায়ী সিদ্ধমন্ত্র দান করেন। ভগবানের সাকার ভাবের মন্ত্র পাইলেও ইষ্টের নিরাকার ভাবের ধ্যান করিতে বাধা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুইই। শ্রীকৃষ্ণমূর্তি বা শিবমূর্তি বা দেবীমূর্তি বাস্তবিক সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।'—যাহারা যেমন ভাবে আমার উপাসনা করে আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি'—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪।১১) শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব, সচ্চিদানন্দময়ী মা। নিরাকার ভাবের সাধকও মন্ত্রজপ দ্বারা শ্রীভগবানের নিরাকার সচ্চিদানন্দস্বরূপের উপলব্ধি অন্তরে বাহিরে ধাপে ধাপে লাভ করেন। সাধনার প্রথমাবস্থায় তাঁহাকে আকাশ বা মহাসমুদ্রের উপমা গ্রহণ করিতে হয়। সর্বব্যাপী আকাশ যেমন সর্ববস্তুতে অনুস্যূত, সেইরূপ অনন্ত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রহিয়াছেন—ভূতপ্রপঞ্চের আধাররূপে; আবার তিনি সবকিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। মহাসমুদ্রের বুকে যেমন ছোট-বড় অগণিত তরঙ্গ অনবরত উঠিতেছে, লয় পাইতেছে সেইরূপ জগৎসংসারের প্রতিটি অভিব্যক্তি অনাদি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে।

* * *

মন্ত্রসাধনার প্রারম্ভে জপ জিহ্বায় ও কণ্ঠে ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়। সাধক নিজেকে একটি ব্যক্তিরূপে বোধ করিতেছেন যথা, 'আমি শ্রীভগবানের ভক্ত, তাঁহার প্রতি ভক্তি বিশ্বাস লাভ করিবার জন্য, তাঁহাকে উপলব্ধির জন্য তাঁহার পবিত্র নাম জপ করিতেছি।' প্রথম প্রথম এই জপক্রিয়া কতকটা যন্ত্রের মতো চলিতে থাকে। মন যেন কোনও রস পায় না। সংশয় উঠিতে থাকে—এই শব্দ উচ্চারণ (শ্রবণযোগ্য অথবা মনে মনে) করিয়া কিভাবে মন শান্ত হইবে, কিভাবে ভগবানকে স্পর্শ করা যাইবে। সাধু-মহাপুরুষরা বলেন, জপসাধনার প্রথম অবস্থায় এইরূপ শুষ্কতা এবং সংশয় আসা স্বাভাবিক। ভয় পাইতে নাই, দমিয়া যাইতে

নাই। বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখিয়া, ফলাফলের দিকে মন না দিয়া নিষ্ঠাসহকারে জপ চালাইয়া যাইতে হয়। এই প্রাথমিক বিক্ষিপ্ত ভাবটা শীঘ্রই কাটিয়া যায়। ক্রমশঃ নামজপে সরসতা ও মনের তন্ময়তা আসিতে থাকে।

জপে প্রীতি যত বাড়িতে থাকে মন্ত্রধ্বনির প্রকৃতিও তত বদলাইতে আরম্ভ করে। উহা আর জিহ্বা বা কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় না। হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে যেন উত্থিত হইতেছে বলিয়া অনুভব হয়। ইষ্টমন্ত্রে আর ইষ্টে পার্থক্য চলিয়া যাইতে থাকে। ইষ্টমন্ত্রের মধ্যে যে ইষ্টের স্বরূপ ওতপ্রোত রহিয়াছেন এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে থাকিলে ইষ্টের সান্নিধ্য এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি-ভালবাসাও বাড়িয়া চলে। বহু সাধক-সাধিকা শ্রীভগবানের পবিত্র নামসাধনার অনুভূতি তাঁহাদের রচিত স্তোত্র, গান প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:

রামনাম মণি দীপ ধরু জীহ দেহরি দ্বার
তুলসী ভিতর বাহিরেহু জো চাহসি
উজিবার।
(তুলসীদাস)

—'হে তুলসীদাস যদি ভিতর বাহির আলোকিত করিতে চাও তো রামনামরূপ প্রদীপ দেহ-ঘরের চৌকাঠে (অর্থাৎ—জিহ্বায়) স্থাপন কর।'

সত্যই মন্ত্রকে ইষ্টস্বরূপ জানিয়া গভীর অনুরাগের সহিত জপ করিতে করিতে শ্রীভগবানের চৈতন্যালোক হৃদয়কে এবং বাহিরের জগৎকে আলোকিত করে।

সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে
আছি॥

সকল আরাধনা, সকল ধ্যান, সকল প্রার্থনা ইষ্টদেবীর নামের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে। উহা মস্তকে বাঁধা হইয়াছে অর্থাৎ কি জাগরণে, কি নিদ্রায় সর্বদা সর্বাবস্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে সঙ্গে রহিয়াছে। ইষ্টদেবীর সত্তা নামসত্তায় ওতপ্রোত। অতএব রামপ্রসাদের কোনও সংশয় বা ভয় আর নাই। কোথায় যাইব, কি হইবে এপারের বা ওপারের কোনও প্রশ্নই আর চিত্তকে আকুলিত করিতে পারিতেছে না। হৃদয় প্রশান্ত।

* * *

মন্ত্রধ্বনি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর আকার গ্রহণ করিয়া চলে। সাধকের হৃদয়ের গভীর হইতে রক্তপ্রবাহের মতো উহা যেন সর্বশরীরে প্রসারিত হইতেছে। হৃদয়ের স্পন্দন যেন মন্ত্রস্পন্দন বলিয়া মনে হইতেছে। স্নায়ুপ্রবাহে ক্রমশঃ ঐ স্পন্দন সংক্রামিত। সাধক অনুভব করিতেছেন, শ্বাসগতি, রক্তগতি, স্নায়ুগতি, হৃদয়স্পন্দন—এগুলি সুসূক্ষ্ম মন্ত্রজপ—আপনা হইতে উত্থিত মন্ত্রধ্বনি। ক্রমশঃ মন্ত্রধ্বনির প্রসার আরও ছড়াইয়া পড়িতেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, পেশীসঞ্চালনে যে স্পন্দন উহা মন্ত্রেরই স্পন্দন। সজীব দেহের প্রত্যেকটি অংশে জপক্রিয়া চলিতেছে। জপ সাধকের নিকট একটি সামগ্রিক ক্রিয়া। শুধু জিহ্বা নয়, কণ্ঠ নয়, হৃদয় নয়, সারা দেহ মন্ত্রজপে যোগ দিয়াছে।

অতঃপর চিত্তবৃত্তিতে মন্ত্রের সঞ্চার। অসংখ্য চিত্তবৃত্তি অনবরত নানা আকারে অন্তঃকরণে দিবারাত্র উঠিয়া আমাদিগকে হাসায়, কাঁদায় ছুটাছুটি করায়—ইহা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। অসংখ্য চিন্তা, সঙ্কল্প, বাসনা, হৃদয়াবেগ। উহাদের প্রবাহ যত দ্রুত চলে, মনের অশান্তিও তত বৃদ্ধি পায়। শান্তি ও সামঞ্জস্যের জন্য আমরা সেইজন্য চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা

করি। আধ্যাত্মিক জীবনে চিত্তসংযমের অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জপের দ্বারা যে চিত্ত শান্ত হয় এবং শান্ত চিত্তে ভগবৎপ্রেম ও শান্তি নামিয়া আসে তাহা শত শত সাধক-সাধিকার প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে জানা যায়। সংশয়ের কারণ নাই।

কিন্তু মন্ত্রসাধনার উচ্চতর স্তরে আর একটি আশ্চর্য অনুভূতি ঘটা সম্ভবপর—চিত্তবৃত্তিতে মন্ত্রের সঞ্চার। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পন্দনগুলি যেমন মন্ত্রের স্পন্দন বলিয়া অনুভূত হইতে পারে তেমনই প্রত্যেকটি চিত্তস্পন্দন মন্ত্রেরই উৎস্ফুরণ রূপে বোধ হয়। মনের যাবতীয় নর্তন যেন মন্ত্রেরই উল্লাস। সারা মন এখন সাধকের মন্ত্রজপে যোগ দিয়াছে। এই অবস্থায় সাধক যখন জপ করিতে বসেন তখন তাঁহার সারা দেহ মন প্রাণ হইতে মন্ত্রধ্বনি উৎসারিত হয়। তাঁহার অহংবোধও মন্ত্র-ধ্বনি। মন্ত্ররূপ ইষ্টের সহিত নিবিড় সান্নিধ্য লাভের ফলে তিনি পরমা শান্তি লাভ করেন। জন্মজন্মান্তরের বিষয়-সংস্কারগুলি পরম শুভ্রতা লাভ করে।

স্বামী বিবেকানন্দের 'শিবস্তোত্রম্'-এর তৃতীয় শ্লোকটি এখানে তুলনীয়।

বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্মিমালা।
প্রচলতি খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্॥

"পূর্বসংস্কাররূপ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, উহা ঘূর্ণায়মান তরঙ্গমালার ন্যায় অতি বলবান ব্যক্তিগণকেও দলিত করিতেছে। 'তুমি-আমি' (দৃশ্য-দ্রষ্টা) রূপ যুগ্ম প্রতীতি হইতে নিস্তার নাই। চিত্তের এই অতিবিকলিত চঞ্চল রূপ যে এক অদ্বিতীয় শিবেরই লীলা-বিলাস তাঁহাকে বন্দনা করি।"

তত্ত্বদৃষ্টিতে বিক্ষেপ একেরই অভিব্যক্তি। অতএব চিত্তস্পন্দনে মন্ত্রের উৎস্ফূর্তি দর্শন আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি স্বাভাবিক পরিণতি।

মন্ত্রধ্বনির পরবর্তী পরিবিস্তার ঘটে বহির্জগতে। বাহির হইতে কতপ্রকার শব্দই না অনবরত আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, মেঘের গর্জন, জলপ্রবাহের কলকলধ্বনি, গাছের পাতার মর্মর, পাখীর কূজন, পতঙ্গের ফরফর, মৌমাছির গুঞ্জন, নানা পশুর নানা প্রকারের ডাক, মানুষের বিচিত্র কোলাহল, জলে স্থলে আকাশে বহুতর মেশিনের কটু যান্ত্রিক শব্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—'যত শুন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে। কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।'

রামপ্রসাদের অনুভবে তাঁহার ইষ্ট জগন্মাতা কালী বর্ণময়ী রূপে প্রতিভাতা। সকল শব্দে মায়ের নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন শব্দই আর চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারিতেছে না, কেননা তাহারা আর সাধারণ শব্দ নয়—ইষ্টমন্ত্র। শব্দ জগৎ এক বিপুল মন্ত্রধ্বনি! বহির্জগতে শব্দ ছাড়া রূপ রস গন্ধ স্পর্শও আছে। মন্ত্র কি এই সকল ইন্দ্রিয়জ্ঞানেও প্রবেশ করিতে পারে? এই সকল পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে কি মন্ত্রের প্রতিভাসরূপে উপলব্ধি করা যায়? অবশ্যই যায়। শ্রীভগবানের নাম এবং শ্রীভগবান একই সত্য—এই প্রতীতি যখন দৃঢ়—অতিদৃঢ়স্তরে উপনীত হইয়াছে তখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ্ঞান যে মন্ত্রধ্বনিরূপে প্রতিভাত হইবে ইহা তো স্বাভাবিকই। উপনিষদ্ বলেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'এই যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ, জানিতেছ তাহা নিশ্চিতই ব্রহ্ম।' (ছান্দোগ্য

উপনিষদ্ ৩।১৪।১)

'ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্।'—'ওঙ্কার ব্রহ্মস্বরূপ। এই যাহা কিছু তাহা ওঙ্কারই।' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১।৮)

'ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্।' 'ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকাল-তীতং তদপ্যোঙ্কার এব।' (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ১) —'ওম্ এই অক্ষর এই যাহা কিছু সব। যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা ঘটিতেছে এবং যাহা ঘটিবে, এমন কি যাহা ত্রিকালাতীত তাহা সবই ওঙ্কার।' মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ বলেন, ওঙ্কারের চারিটি মাত্রা—অ উ ম এবং অবর্ণনীয়, অচিন্তনীয় চতুর্থ মাত্রা যাহাকে অমাত্রা বলা হয়। যাহা কিছু বাক্যমনের গোচর তাহা প্রথম তিন মাত্রার অন্তর্গত। অবাঙ্‌মনসো-গোচর নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক হইল ওঙ্কারের চতুর্থ মাত্রা। নির্গুণ ব্রহ্মে সৃষ্টি স্থিতি লয় নাই, বন্ধন নাই, মুক্তি নাই—কোনও ব্যবহার নাই, বর্ণনা নাই। কিন্তু সেই নির্গুণ ব্রহ্ম যখন সগুণ হন তাঁহাকে তখন আমরা সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা পরমেশ্বর বলি। তিনি তখন আমাদের বাক্যমনের গোচর হন। তখন আমরা তাঁহার উপাসনা করিতে পারি, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি।

সচ্চিদানন্দ সগুণব্রহ্ম পরমেশ্বর সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বিস্তারের প্রারম্ভে নিজ সত্তা হইতে আকাশ (প্রথম ভূত) সৃষ্টি করেন। তিনিই কারণ, তিনিই কার্য। অতএব আকাশ সচ্চিদানন্দ সত্তা হইতে ভিন্ন নয়। সচ্চিদানন্দই আকাশরূপে প্রতীয়মান। আকাশ হইতে দ্বিতীয় ভূত বায়ু। বায়ু হইতে তেজ (অগ্নি), তারপর অপ্ (জল), অপ্ হইতে পৃথিবী। এই পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিতেই কারণরূপী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ওতপ্রোত রহিয়াছেন। পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু সৃষ্ট হয়। বেদান্ত বলেন কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থে পরমাত্মা অনুস্যূত রহিয়াছেন। অজ্ঞানের জন্য আমরা নামরূপই দেখি, নামরূপের পশ্চাতে ব্রহ্মকে দেখিতে পাই না। সাধনার ফলে অজ্ঞান কাটিয়া গেলে আমরা সর্বত্র ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারি।

সগুণ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিবিস্তার শব্দব্রহ্ম ওঙ্কারের দিক দিয়া বর্ণনা করিলে বলা যায় নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ অ-মাত্রা হইতে অ-উ-ম সংযুক্ত আদি-নাদ ওম্ উদ্ভূত হয়। সেই প্রণবরূপ প্রথম ধ্বনি হইতে যাবতীয় শব্দ উৎসারিত। বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তু কোনও না কোনও নাম বা শব্দের সহিত সংযুক্ত। বিশ্বজগৎ যেমন বস্তু বা পদার্থময় তেমনি অন্য দিক দিয়া শব্দময়ও। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বস্তু ও তন্নির্ণায়ক সংজ্ঞা অর্থাৎ নামী ও নামে কোনও ভেদ নাই। যাহা বস্তু তাহাই তাহার অভিধান, যাহা নামী তাহাই নাম। সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা প্রহেলিকা মনে হইতে পারে কিন্তু সাধকের অধ্যাত্মদৃষ্টি বিকশিত হইলে এই তত্ত্ব অসন্দিগ্ধ অনুভূতিরূপে প্রকাশ পায়। শ্রীভগবানের নাম মহামন্ত্র যে জিহ্বা ও কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া স্তরে স্তরে সাধকের অন্তরে বাহিরে প্রসারিত হইয়া সারা বিশ্ব-প্রপঞ্চকে ছাইয়া ফেলিবে ইহা ভাগ্যবান সাধকের পক্ষে অসম্ভব নয়।

বিশ্বতঃ-প্রসারিত সর্বানুপ্রবিষ্ট মন্ত্রধ্বনির উপলব্ধি সগুণ শব্দব্রহ্মের অনুভূতি। মন্ত্রধ্বনি কি সগুণ হইতে নির্গুণে পৌঁছিতে পারে ? হাঁ, পারে। রাজযোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক্ জন্মহীন মৃত্যুহীন চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাকে (পুরুষ) সাক্ষাৎকার করিয়া

তাঁহার সহিত তাদাত্ম্যলাভ করেন। জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য নেতি নেতি বিচার দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ চৈতন্যসত্তায় অবস্থান। ভক্তিযোগী জগৎকে শ্রীভগবানের লীলাবিলাস বলিয়া দেখেন। তিনি নির্গুণ নিরাকার অবাঙ্‌মনসোগোচরে নিজেকে বিলীন করিতে চান। কর্মযোগীর লক্ষ্যও অজ্ঞান হইতে মুক্তি—ভক্তিপথেই হউক বা জ্ঞানপথেই হউক।

মন্ত্রসাধনা সকল যোগের সহিতই সংযুক্ত। এই সাধনাও সর্বশেষে সাধককে অবাঙ্‌মনসোগোচরে লইয়া যাইতে পারে। সগুণ শব্দব্রহ্ম তখন পূর্বোক্ত অশেষ পরিবিস্তার হইতে ক্রমসঙ্কোচ প্রাপ্ত হইতে থাকেন। শুধু মন্ত্রধ্বনি। সেই ধ্বনি সবকিছুকে এখন গুটাইয়া আনিয়াছে। শুধু মন্ত্রধ্বনি। অবশেষে অ-উ-ম—অমাত্রায় বিলীন। মন্ত্রধ্বনি শুদ্ধ। মন্ত্র এখন নিঃশব্দ স্বরূপ লাভ করিয়াছে। শব্দব্রহ্ম এখন আর সগুণ নন—নির্গুণ। তথাপি এই বাক্যমনের অগোচর নির্গুণ-তত্ত্বকে শব্দব্রহ্ম বলিতে বাধা নাই। উহাও মন্ত্রধ্বনি—যে ধ্বনি স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে শোনা যায় না—যাহা সাধকের আত্মস্বরূপ—যাহা স্বসংবেদ্য।

এইভাবে মন্ত্ররূপী ভগবান তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তকে উত্তরোত্তর তাঁহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া কৃতকৃতার্থ করেন। মন্ত্রধ্বনি থামিয়াও থামে না। শ্রবণ, মনন ও বর্ণনযোগ্য ধ্বনি অশ্রুত অমন্তব্য, অবর্ণনীয় ধ্বনিরূপে চিরবর্তমান থাকে।

প্রতিমাশিল্পে মহিষমর্দিনী: কয়েকটি স্মরণীয় তথ্য

ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত*

মহিষাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত দেবতারা মধুসূদন ও মহাদেবের শরণাপন্ন হলে তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তেজ বিচ্ছুরণ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে ব্রহ্মারও মুখমণ্ডল থেকে তেজোরাশি বিনির্গত হতে লাগল। এই তিন দেবতার ও অন্যান্য দেবতাদের বিচ্ছুরিত তেজোরাশি পুঞ্জীভূত হয়ে দেখা দিলেন এক অলোকসামান্যা নারী, শাস্ত্রকারের ভাষায় 'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্। একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা।' এই নারীই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তিভূতা সনাতনী দেবী মহামায়া, মহিষাসুরনাশিনী পরমারাধ্যা দেবী দুর্গা। আবির্ভাবের পর দেবীকে দেবতারা তাঁদের বিশেষ বিশেষ প্রহরণ ও বসনভূষণ দান করেন। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করলে দেবলোকে শান্তি স্থাপিত হয়।

---

* অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ইঁহার প্রধান গ্রন্থ A Tribal History of Ancient India : A Numismatic Approach প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও মুদ্রাতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সর্বজনস্বীকৃত। অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থ : Indian Historiography and Rajendralal Mitra এবং 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি'। Comprehensive History of India, Dictionary of National Biography প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ইঁহার রচনায় সমৃদ্ধ। একাধিক বিশিষ্ট গ্রন্থের সম্পাদনা তথা বঙ্গানুবাদ ইঁহার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে বর্ণিত এই সুবিদিত কাহিনী সুপ্রাচীন কাল থেকে ভাস্কর্যে ও চিত্রে রূপায়িত হয়ে এসেছে। দেবী, দেবীভাগবত, কালিকা, বরাহ প্রভৃতি অন্যান্য পুরাণে বর্ণনায় অল্পবিস্তর তারতম্য থাকলেও মূল কাহিনীর কাঠামো অবিকৃত রয়েছে। মূর্তিতত্ত্ব সম্পর্কীয় গ্রন্থগুলিতেও দেবীর রূপের বর্ণনাগত পার্থক্য দুর্লক্ষ্য নয়। তবে পুরাণ ও মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক সব ক'টি গ্রন্থেই দেবীর সংহারকারিণী রূপ স্পষ্টভাবে বর্ণিত; এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু মহিষমর্দিনী মূর্তির মধ্যে ঐ রূপটির সাক্ষাৎ মেলে। মধ্যপ্রদেশে ভিলসার কাছে উদয়গিরি নামে জায়গাটিতে কয়েকটি গুহা আছে, এদের একটির গায়ে খোদিত চতুর্থ-পঞ্চম শতকের মূর্তিটি দেখলে দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত দেবীর আক্রমণভঙ্গীর কথা মনে পড়ে যায়: 'এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্। পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ॥' উদয়গিরির মূর্তিতে দেবী মহিষাকৃতি অসুরকে হননে নিরত, তাঁর বারো হাতের মধ্যে প্রসারিত দুই হাতে গোধা ধরা আছে; অন্য কোন প্রাচীন দৃষ্টান্তে গোধা না থাকাতে উদয়গিরির মূর্তিটি আকর্ষণীয়। গোধার সঙ্গে দেবীর সংযোগ পূর্ব ভারতের, বিশেষত বাংলার, ঐতিহ্যে ও প্রতিমাতে লক্ষ করা যায়। বাংলায় প্রচলিত কালকেতুর গল্পে দেবীর স্বর্ণগোধিকার রূপ ধারণের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

আমাদের প্রতিমাশিল্পে মহিষমর্দিনীর রূপের বৈচিত্র্য মনোযোগের যোগ্য। প্রথমত, দেবীর হাতের সংখ্যা সর্বত্র সমান নয়; যদিও তিনি সাধারণ্যে দশভুজা নামে পরিচিত, বিভিন্ন প্রাচীন প্রতিমানিদর্শনে তাঁর হাতের সংখ্যা দুই থেকে বত্রিশ পর্যন্ত প্রসারিত, অর্থাৎ তাঁর ভুজসংখ্যা কোথাও দুই, চার, ছয়, আট, বারো, কোথাও কোথাও ষোল, আঠারো, কুড়ি ও বত্রিশ। পূর্বোক্ত উদয়গিরির মূর্তিতে দেবী দ্বাদশভুজা এবং বর্তমানে তিনি দশভুজা রূপে পূজিত হন। দ্বিতীয়ত, মহিষাসুরের রূপায়ণে শিল্পীর প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য: মহিষাসুর কখনও পূর্ণাঙ্গ মহিষাকৃতি, কখনও তাঁর দেহ মানুষের, মুণ্ড মহিষের; কখনও বা তিনি বিচ্ছিন্নশির পশুস্কন্ধ থেকে কুপিত মানুষরূপে বেরিয়ে আসছেন; এ কালের প্রতিমাতে এই তৃতীয় রূপে মহিষাসুর চিত্রিত হন। তৃতীয়ত, বেশ কয়েকটি পুরানো নিদর্শনে দেবীর বাহন সিংহ অনুপস্থিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পূর্বোক্ত উদয়গিরির মূর্তির সঙ্গে মথুরা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ছ'টি নিদর্শনের উল্লেখ করা যায়, এদের কোনটিতেই সিংহকে দেখানো হয় নি। চতুর্থত, বর্তমানে শারদীয় দুর্গোৎসবে পূজিত মৃন্ময়ী প্রতিমাতে দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ উপস্থিত থাকেন, কোন প্রাচীন নিদর্শনে মহিষমর্দিনীর সঙ্গে এই দেবচতুষ্টয় রূপায়িত হন নি।

মহিষমর্দিনী-প্রতিমা সংক্রান্ত এই চারটি স্মরণযোগ্য তথ্যের সঙ্গে একটি নতুন তথ্য সংযোগ করা প্রয়োজন। সম্প্রতি কয়েকটি দৃষ্টান্তে মহিষমর্দিনী দুর্গাকে পূর্ণাবয়ব নরাকৃতি মহিষাসুরের সঙ্গে সংগ্রামে নিরত দেখা গেছে। এদের মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শনটি পাওয়া গেছে দক্ষিণভারতের কাঞ্চীপুরমে, বর্তমানে দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়মে সংরক্ষিত, অষ্টম শতাব্দীর এই প্রতিমাতে কুপিতা দেবী মনুষ্যদেহী অসুরকে সজোরে আক্রমণ করতে উদ্যত, তাঁর মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হাতে ছুরিকা

জাতীয় অস্ত্র (অন্ত হাতের জিনিসটি অস্পষ্ট), অসুরের ডান হাতে তরবারি ; শিল্পীর তক্ষণ-কৌশল ও বাস্তববোধের পরিচায়ক হিসাবে মূর্তিটি অনবদ্য। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ মেলে রাজস্থানের জগৎ (উদয়পুর থেকে ৩৭ মাইল দূরে) নামে একটি গ্রামের অম্বিকামন্দিরের দক্ষিণ পাত্রের একটি কুলুঙ্গিতে (চিত্র ১) ; দশম শতাব্দীর এই প্রতিমাটিতে অষ্টভুজা দেবী নরাকৃতি মহিষাসুরকে দু হাতে চেপে ধরে আছেন, মহিষাসুর ডানহাতে মুদ্গর নিয়ে দেবীকে আক্রমণে উদ্যত, কিন্তু ব্যর্থকাম হয়ে যেন রাগে ফুঁসছেন। রাজস্থানের এই নিদর্শনটিও শিল্পগুণে নন্দনীয়। এ জাতীয় বিশিষ্ট আর-একটি নিদর্শন (চিত্র ২) বর্তমান লেখক গৌহাটির সরকারী মিউজিয়ামের সংগ্রহের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন, তিন-সুকিয়ায় আবিষ্কৃত এই মূর্তিটি ধাতুনির্মিত, আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের ; দশভুজা দেবীর ডান পা সিংহের উপর, বাম পা নররূপী অসুরের ডান কাঁধে, অসুরের ডান হাতের কনুই সিংহ কামড়ে ধরেছে, দেবীর হাতের প্রহরণগুলি বর্তমানে লুপ্ত, অনুমান হয় স্বতন্ত্রভাবে তৈরী অস্ত্র ও লাঞ্ছনগুলি পূজার সময় হাতে সংলগ্ন করা হতো, দেবীর মুখ-মণ্ডল, মঙ্গোলীয় ছাঁদের, শিরোভূষণ ও পরিচ্ছদেও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব উচ্চারিত। তবে পূর্বোক্ত কাঞ্চীপুরমের শিলাপ্রতিমার সঙ্গে তিনসুকিয়ার নিদর্শনের একটি দর্শনীয় পার্থক্য আছে : অসমীয়া শিল্পী মহিষাসুরের চিত্রণের সময় তার পশুরূপকে একেবারে ভুলতে পারেন নি, তাই নরাকৃতি অসুরের ডান পায়ের কাছে দেবী কর্তৃক কর্তিত পশুমুণ্ডটিকে সংস্থাপিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে দক্ষিণ-ভারতের পল্লব যুগের শিল্পীদের কথা ; তাঁদের হাতে কখনও কখনও মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গা কর্তিত মহিষমুণ্ডের উপর দণ্ডায়মানা রূপে চিত্রিত, অসুরের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের দৃশ্য অনুপস্থিত। এ ধরনের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত মার্কিন দেশের বস্টন মিউজিয়ামে প্রদর্শিত।

মহিষমর্দিনীর প্রাচীনতম রূপায়ণের পরিচয় বহন করছে একটি পোড়ামাটির ভাস্কর্যফলক, পাওয়া গেছে রাজস্থানের নগর নামে একটি জায়গায়। আনুমানিক প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীর এই শিল্পকৃতিতে চতুর্হস্তা দেবীর বাম পা মাটিতে বসা সিংহের উপর, ডান পা সামনের মহিষের দিকে প্রসারিত, দেবীর মূল ডান হাত মহিষের পিঠে ন্যস্ত, বাঁ হাতে তিনি পশুটির জিভ টেনে বার করছেন, তাঁর পিছনের দুই হাতের লাঞ্ছনের একটি আয়তাকৃতি খেটক, অন্যটি অস্পষ্ট। রাজস্থানের এই নিদর্শনে সিংহ উপস্থিত থাকলেও সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের অনেক প্রতিমাতে দেবীর বাহনটি অনুপস্থিত (উদয়গিরির দৃষ্টান্ত স্মরণীয়), এবং এখানে মহিষাসুর পরিপূর্ণভাবে পশুর রূপে চিত্রিত। অনুমান হয়, গুপ্তযুগের শেষ অথবা গুপ্ত-পরবর্তী যুগ থেকে অসুরনিধনের সময় দেবীর বাহন হিসাবে সিংহের রূপায়ণ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ দেবীর এই সুপ্রাচীন ও অপরিহার্য বাহন দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকতে পারেন না, বিশেষ করে দেবী যখন মহিষাসুরের মতো দুর্ধর্ষ অসুরের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ।

রাজস্থানের জগৎ থেকে পাওয়া মহিষমর্দিনী মূর্তি। এখানে অসুর
পূর্ণাবয়ব নররূপে চিত্রিত
চিত্র ১

আসামেব তিনসুকিযাতে প্রাপ্ত ধাতবমূর্তি : এখানেও মহিষাসুব সম্পূর্ণ নবাকৃতি
চিত্র ২

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'

ডক্টর রমা চৌধুরী*

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ॥'
(ঈশোপনিষদ্ ১)

'ঈশ্বর দ্বারাই কর আবৃত
যা কিছু চঞ্চল আছে এ ভুবনে।
ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর তাঁকে
করোনা লোভ পরের ধনে॥'

এই অপূর্ব সুন্দর সর্বজনসমাদৃত মন্ত্রের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি সর্বদিক থেকেই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং অভিনব—যেহেতু এস্থলে এরূপ একটি নূতন অত্যাশ্চর্য তত্ত্বের উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সাধারণভাবে উপলব্ধি করা দুষ্কর।

তার কারণ হ'ল এই যে, সাধারণতঃ 'ত্যাগ' ও 'ভোগ'কে পরিপূর্ণভাবে পরস্পর-বিরোধী রূপেই গ্রহণ করা হয়। প্রথমতঃ 'ভোগ'কে আমরা বলি 'বাসনা-কামনা'জন্য, এবং সর্ববাদিসম্মতিক্রমে এরূপ অন্ধ-অর্গল-বিহীন সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপর সাংসারিক বাসনা-কামনা অথবা ভোগেচ্ছাই সকল অনর্থের, অর্থাৎ, এই 'সর্বং দুঃখং দুঃখম্', 'সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্', 'সর্বং শূন্যং শূন্যম্'—আদ্যোপান্ত দুঃখশোকক্লিষ্ট, আদ্যোপান্ত ক্ষণস্থায়ী, আদ্যোপান্ত শূন্যগর্ভ পার্থিব জীবনের প্রথম ও প্রধান কারণ। এটি ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের দুটি মূলীভূত ভিত্তির অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই সর্বজনবিদিত এবং সর্বজনসমাদৃত তত্ত্ব বা মতবাদ হ'ল—'কর্মবাদ' এবং 'জন্ম-জন্মান্তরবাদ'। কর্মবাদানুসারে যে কোনো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সকাম অর্থাৎ ফল-ভোগেচ্ছাসহিত-কৃত কর্মের ফল কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হবেই হবে অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য-ভাবেই—এটি ত ন্যায়েরই অমোঘ বিধান। জেনে-শুনে, ভেবে-চিন্তে, স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দ-চিত্তে, একটি বিশেষ ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কর্মকর্তা একটি বিশেষ সকাম কর্ম সম্পাদিত করবেন—অথচ তার যথোপযুক্ত ফল—তা ভালই হোক বা মন্দই হোক—ভোগ তিনি করবেন না—তা ত ন্যায়ধর্মানুসারী নয় কোনো-ক্রমেই। বরং তিনি যদি যথাযথভাবে সেই সকাম কর্মটির ন্যায্য ফল ভোগ করেন, আজ না হয় কাল, এ জন্মে না হয় পরজন্মে, তাহলেই ত ন্যায়ের মর্যাদা, ন্যায়ের অমোঘত্ব, ন্যায়ের অপ্রতিহতত্ব, ন্যায়ের সার্বভৌমত্ব রক্ষিত হয়।

এরূপে 'কর্মবাদে'র অবশ্যম্ভাবী সহচর, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত অংশ হ'ল 'জন্মজন্মান্তরবাদ'। কারণ, একই জন্মে কৃত অসংখ্য সকাম কর্মের

---

* প্রাক্তন উপাচার্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি—(১) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত, (২) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপাচার্যা এবং (৩) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সদস্যা।

ইনি কুড়িটিরও অধিক আধুনিক সংস্কৃত নাটিকা রচনা করিয়া এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঐগুলির অভিনয় পরিচালনা করিয়া ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রচারে ব্রতী রহিয়াছেন। দর্শন-বিষয়ক ইঁহার মূল্যবান প্রকাশনগুলিও উল্লেখযোগ্য।

সমস্ত যথাযোগ্য ন্যায্য ফল ভোগ করা সেই কর্মকর্তার পক্ষে অসম্ভব ব'লে ন্যায়ের অনিবার্য বিধানানুসারে তাঁকে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতেই হয় সেই সকল প্রাক্তন অভুক্ত কর্মের যথাযথ ফল ভোগের জন্য। কিন্তু এই নূতন জন্মে অবিদ্যা-অজ্ঞানান্ধ তিনি পুনরায় পূর্ববৎ নূতন নূতন সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হন—তাদের ফল অনেকই পূর্ববৎ অভুক্ত থেকেই যায়; যেজন্য তাঁকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতেই হয় পূর্বোক্ত ন্যায়ের অলঙ্ঘ্য নীতি অনুসারেই। এবং এইভাবে চলে জন্মজন্মান্তরের লীলা-খেলা—সেই সঙ্গে অসংখ্য দুঃখ-শোকের প্রচণ্ড প্রতাপ, এবং সেজন্য জীবের স্বকীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা, ভোগলোলুপতা, অহং-মম-ভাব-প্রবণতাই ত তাঁর সকল দুর্দশা-দুর্গতির কারণ—তাঁর বারংবার অসংখ্য শোকদুঃখসংবলিত জন্মের কারণ। তাহলে উপায়?

সমগ্র পৃথিবীর প্রতি, সমগ্র জীবের প্রতি বাসনা-কামনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ ক'রে নিষ্কাম কর্ম করাই এক্ষেত্রে একমাত্র উপায়।

সেজন্য, 'ভোগে' লিপ্ত হয়ো না—ত্যাগ কর, ত্যাগ কর সমগ্র সাংসারিক জীবনের সমস্ত ভোগলালসা, বাসনা-কামনা এবং সেই সঙ্গে যথাযথ সাধনও অবলম্বন কর যথোপযুক্তভাবে। তাহলে সেই সব ভোগেচ্ছাশূন্য, সেই সব ত্যাগদীপ্ত সাধনই ত হবে তোমার জন্ম-জন্মান্তরের নিরন্তর ঘূর্ণায়মান 'সংসার-চক্র' থেকে পরিত্রাণ পাবার মহতী মুক্তি ও শাশ্বতী শান্তি লাভের একমাত্র উপায়।

এরূপে, 'ভোগ' বর্জন কর; 'ত্যাগ' অবলম্বন কর—এই ত হ'ল আমাদের বেদোপনিষদ্ কর্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম-দর্শন-নীতি-তত্ত্বের মূল কথা।

তাহলে, এক্ষেত্রে এরূপ অত্যদ্ভুত, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কথা বলা হয়েছে কেন যে—'ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর?' তা-ও আবার যাকে তাকে নয়, স্বয়ং পরমেশ্বরকে—কী বাতুলবৎ এই উক্তি! পুনরায়, 'ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর'—এ-ই বা কেমন কথা? ত্যাগ ও ভোগ ত আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় আদ্যোপান্ত পরস্পরবিরোধী—তাহলে তাদের সহাবস্থিতিও ত আরেকটি সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা! তাহলে? তাহলে বেদোপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষিরা কি এরূপ অসম্ভব অযৌক্তিক অসত্য তত্ত্বই দিচ্ছেন আমাদের শিক্ষা? কী অকল্পনীয় এই সিদ্ধান্ত!

নিশ্চয়ই অকল্পনীয়, নিশ্চয়ই অসম্ভব, নিশ্চয়ই অযৌক্তিক, নিশ্চয়ই অসত্য এই সিদ্ধান্তটি—উপরের অপূর্ব মন্ত্রটির মর্মার্থ উপলব্ধি না করার জন্যই ত এর উৎপত্তি, এর সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক উপলব্ধি। কী সেই অপরূপ মর্মার্থ?

তা হ'ল এই:

প্রথমতঃ, পরমেশ্বরকে ভোগ করব না ত কাকে আবার ভোগ করব এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, বিশ্বমানবসমাজে তিনি ব্যতীত আর অন্য কে-ই বা আছেন বলুন! শ্রুতি ও যুক্তি উভয়সম্মত এই মহাসিদ্ধান্তটিকে ত এইভাবে অবহেলা করা চলে না, চলে না উপনিষদের সেই রোমাঞ্চকর রমণীয় রসঘন অমৃতবাণীসমূহকে অবিশ্বাস করা—

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।১৪।১)

'ব্রহ্মেদং সর্বম্' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১)

'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।৮।৭ ইত্যাদি)

'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১৯)

'অহং ব্রহ্মাস্মি' (ঐ ১।৪।১০)

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম।'

'ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।'

'তিনিই তুমি।'

'এই আত্মাই ব্রহ্ম।'

'আমিই ব্রহ্ম।'

এবং শ্রুতির সঙ্গে একই সঙ্গে সুর মিলিয়ে যুক্তিও কি সেই একই কথা বলে না? নিশ্চয়ই। সেই যুক্তি হ'ল এই যে, সকল ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকের মতে ব্রহ্ম পরম-কারণ, জীবজগৎ তাঁর কার্য—এবং কারণ কার্যে পরিণত হয়ে—রূপায়িত হয়ে, লীলায়িত হয়েই ত কার্যটিকে সৃষ্টি করতে পারে—অন্যথায় নয়; এবং সেক্ষেত্রে কারণ ও কার্য সমস্বরূপ হতে বাধ্য। যেরূপ, কারণ মৃৎপিণ্ড কার্য মৃন্ময় ঘটে পরিণত, রূপায়িত লীলায়িত হয়েই সেই ঘটটিকে সৃষ্টি করে এবং সেজন্য মৃৎপিণ্ডও মৃত্তিকাস্বরূপ, মৃন্ময় ঘটও মৃত্তিকা-স্বরূপ—মৃৎপিণ্ড থেকে অন্যান্য কোনো প্রকারের ঘট কি পাওয়া যায়, পাওয়া যায় কি সুবর্ণ ঘট, রৌপ্য ঘট, লৌহ ঘট? না, কদাপি নয়। একই ভাবে, ব্রহ্ম কারণরূপে জীব-জগতে কার্যরূপে স্বয়ং পরিণত রূপায়িত লীলায়িত হয়েছেন—তাহলে তিনিও ব্রহ্ম-স্বরূপ, জীবজগৎও ব্রহ্মস্বরূপ—এই যুক্তিকে খণ্ডন করবেন কে?

অতএব সংসারে সকল বস্তুই ব্রহ্ম ব'লে যে কোনো তথাকথিত পার্থিব দ্রব্য বা জীবকে ভোগ, নিশ্চয়ই ব্রহ্মকেই ভোগ। এরূপ 'ভোগে'র প্রকৃত-প্রকৃষ্ট-পরিপূর্ণ অর্থ কি?-তার অর্থ হ'ল এই—পৃথিবীতে যা কিছু আমাদের প্রিয়, যা কিছু আমাদের প্রয়োজনীয়, যা কিছু আমাদের প্রাপ্তব্য, তা সবই ব্রহ্ম—এক-মাত্র ব্রহ্ম। স্মরণ করুন বৃহদারণ্যকোপনিষদের সেই সুমধুর 'প্রিয়তত্ত্ব'—

'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি'—ইত্যাদি। (২।৪।৫)

'অয়ি! পতির জন্যই কামনাবশতঃ, অথবা পতির প্রতি প্রীতিবশতঃই পতি প্রিয় হন না, আত্মার জন্য কামনাবশতঃই অথবা আত্মার প্রতি প্রীতিবশতঃই পতি প্রিয় হন।'

এরূপে পতি পত্নী পুত্র বিত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় স্বর্গাদি-লোকসমূহ দেবগণ ও ভূতসমূহের উল্লেখ ক'রে সেই একই কথা বলা হয়েছে বারংবার—এবং পরিশেষে সার্বজনীন সিদ্ধান্ত হ'ল এই—

'ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।' (২।৪।৫)

'অয়ি! সর্ববস্তুর জন্য কামনাবশতঃ অথবা সর্ববস্তুর প্রতি প্রীতিবশতঃ সর্ববস্তু প্রিয় হয় না; আত্মার জন্য কামনাবশতঃ অথবা আত্মার প্রতি প্রীতিবশতঃই সর্ববস্তু প্রিয় হয়।'

এর অর্থ হ'ল নিশ্চয়ই এই যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে কামনা ব্রহ্মকেই কামনা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি প্রীতি ব্রহ্মেরই প্রতি প্রীতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভোগ ব্রহ্মেরই ভোগ।

ব্রহ্মকে ভোগের আরেকটি সুমধুর অর্থ হ'ল এই যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ দূরের, ভয়ের, সম্ভ্রমের শুষ্ক শূন্য সুকঠোর উচ্চ-নীচ সম্বন্ধ নয়—অতি নিকটের, অতি প্রাণের, প্রীতির, মৈত্রীর সমপর্যায়ভুক্ত সুমধুর সুললিত সুকোমল সম্বন্ধ। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি নিশ্চয়ই, ভক্তি করি নিশ্চয়ই; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, তাঁকে আমরা

ভালবাসি ; অতি আপন জন, অতি নিকট জন, অতি প্রিয় জন, অতি সুহৃদ্ জন রূপে তাঁকে আমরা প্রাণমন দিয়ে ভালবাসি—তিনিই ত আমাদের প্রিয়তম সখা, প্রিয়তম জন, প্রিয়তম ধন—বৈষ্ণব-বেদান্তের অতি সাহসী ভাষায়—আমাদের 'পরাণ বঁধু', আমাদের 'মনের মানুষ'—

'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা' ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।৮)

'এই যে অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়।'

এরূপ মধুরতম মোহনতম সুন্দরতম সুভগতম স্নিগ্ধতম শান্ততম পুণ্যতম পূততম 'ভোগে'র প্রধান লক্ষণ হ'ল এই যে, এটিকে হতে হবে ত্যাগসমন্বিত ওতপ্রোতভাবে। বস্তুতঃ, ত্যাগের একমাত্র স্বরূপই হ'ল এই যে, তা সম্পূর্ণরূপেই নিষ্কাম। আমরা আমাদের পরমাদরের পরব্রহ্মকে শ্রদ্ধা করব, ভক্তি করব, প্রীতি করব, সেবা করব, পূজা করব তাঁর নিকট থেকে ধনজনমানপ্রাণপ্রমুখ কোনো পার্থিব বস্তু লাভের আশায় নয়, আকাঙ্ক্ষায় নয়, আগ্রহে নয়—এমন কি, জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মুক্তি লাভের জন্যও নয় বিন্দুমাত্রও—কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে। পৃথিবীতে অবশ্য আমাদের সাংসারিক জীবনে এরূপ সম্পূর্ণ নিষ্কাম শ্রদ্ধা, নিষ্কাম ভক্তি, নিষ্কাম প্রীতি, নিষ্কাম সেবা, নিষ্কাম পূজার দৃষ্টান্ত হয়ত একটিও নেই—সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ ও ভালবাসা, সন্তানের জন্য মাতার সেবা ও ত্যাগ ব্যতীত। সেইজন্যই এই সুবিখ্যাত ঈশোপনিষদের প্রারম্ভেই এরূপ সজোরে নির্দেশদান করা হয়েছে :

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—

'ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর তাঁকে।'

সংসারে আমরা প্রায়ই দেখি দুটি বিপরীতমুখী চরম অবস্থা—সম্পূর্ণ শুষ্ক শূন্য কঠিন কঠোর কর্তব্যবোধ থেকে সেবা, এবং সম্পূর্ণ বাসনা-কামনা-সিক্ত আসক্তি থেকে সেবা। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও যে অত্যাশ্চর্য কথা বলেছেন নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে—সেই অনুসারে এক্ষেত্রে ভাবাবেগশূন্য কঠোর কর্তব্যবোধ এবং সকাম ভাবোদ্বেল আসক্তি—উভয়কেই সমান পরিত্যাগ করতে হবে—আনতে হবে সেস্থলে 'প্রীতি' যার একমাত্র প্রকৃত অর্থ হ'ল নিষ্কাম ভালবাসা—বিশ্বরূপ পরমাত্মাকে। এই ত হ'ল 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'-র অন্তর্নিহিত মর্ম।

এবং তখন কি হয়? তখন আমাদের পরম প্রিয়কে সম্পূর্ণ পবিত্রভাবে নিষ্কামভাবে ভালবেসে—তাঁকে সেভাবে একান্ত আপনভাবে পেয়ে, তাঁরই রূপ-মধুরিমা, তাঁরই আনন্দ-অমৃত, তাঁরই মাধুর্য-ঐশ্বর্যই ত আমরা অন্তরে-বাহিরে উপলব্ধি করি অহরহ—তখন কোথায় বা রোগ, কোথায় বা শোক, কোথায় বা পাপ, কোথায় বা তাপ, কোথায় বা জরা, কোথায় বা মরণ—তখন সবই ত আনন্দোচ্ছলিত, সবই ত অমৃতরসঘন, সবই ত মধুময়। তখন—

'মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতি-

মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো, ভবন্তু নঃ ॥'
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৬।৩।৬)

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু

'বায়ুর হিল্লোলে হিল্লোলে
হয় মধু প্রবাহিত।
তটিনীর কল্লোলে কল্লোলে
হয় মধু প্রবাহিত ॥
মধুময় হোক ওষধিসমূহ
মধুময় উষা রজনী-দিন।
মধুময় হোক পৃথিবীর ধূলি,
মধুময় স্বর্গ পিতা অমলিন ॥
মধুময় হোক বনস্পতি
মধুময় সূর্য জ্যোতির্ময়।
মধুময় হোক গাভীবৃন্দ
মধুময় মধুময় ॥
মধুময় মধুময় ॥
মধুময় মধুময় ॥'
ওঁ শান্তিঃ

আবাহনম্

অধ্যাপকশ্রীবিধুভূষণভট্টাচার্যসপ্ততীর্থেন কৃতম্

নমো নমো হিমগিরিকন্যে !
নমো নমো দেবি শরণ্যে !
সিংহবিহারিণি দুঃখনিবারিণি !
শক্তিমিহার্পয় বলশূন্যে।
এহি শরণাগতশরণ্যে !

পাপকুহূনিশি তিষ্ঠতি দিশি দিশি
মোহতিমিরততিরতিপীনা
নীলনভসি নব-শারদবিধুরিব
মম হৃদয়ে ত্বং ভব লীনা।

শুভপদকমলং তব বন্দে
শিবসঙ্গতপরমানন্দে !
নাশয় দুর্গতিমথ কুরু সম্প্রতি
অভয়ং জগদয়ি সুরধন্যে !
এহি শরণাগতশরণ্যে !

ভৈরবি ! কৃতযুদ্ধবিলাসং
দর্পিতবলিদৈত্যবিনাশম্
অয়ি শঙ্করি তব শক্তিমহার্ণব-
ফেনকণালবমিহ মন্যে
এহি শরণাগতশরণ্যে !

লোভহলাহল-দংশনবিহ্বল-
সজ্জনগণচিত্তবিভঙ্গঃ
বিশ্বভুবনমধিগর্জতি নিরবধি
লম্বিতফণকামভুজঙ্গঃ।

করুণামৃতমিহ খলু বিশ্বে
বর্ষয় ভাস্বরতনুদৃশ্যে !
এহি মহেশ্বরি সর্বশুভঙ্করি !
ভুবি শারদসময়ে পুণ্যে।
এহি শরণাগতশরণ্যে !

করুণা অলৌকিকী

শ্রীদিলীপকুমার রায়*

এ-সংসারে অনেক কিছুই ঘটে
বুদ্ধি খুঁজে পায় না চাবি যার।
তাই সে-কাজি রটায় স-দাপটে :
ভেল্কি এসব—নগণ্য, অসার।

ছায়াবাজি—কেবল শিশুরাই
গায় দিয়ে হাততালি তারস্বরে :
সাবাস! অপরূপ! জয় জয় ভাই!
আজ গুণীকে সবাই প্রণাম ক'রে

ভাসিয়ে দেব কেঁদে—মরি মরি!
কী জাদুই যে জানেন জাদুকর,
অঘটনের রাজা! হরি হরি!
ঝরান যিনি দুহাতে তাঁর বর।

বহুমানী বুদ্ধি রেগে বলে :
ভাসিয়ে দিবি কেঁদে—উচিত যাকে
উড়িয়ে দেওয়া হেসে ধরাতলে!
মান দেওয়া কি চলে যাকে তাকে?

বুদ্ধি বলে বলুক সে যা চায়
বৈজ্ঞানিকী ঢঙে মেঘলা মুখে।
অজ্ঞ শুধু কৌতুকই জোগায়
যখন ধমক দেয় সে উঠে রুখে।

কিন্তু তুমি বন্ধু তরুণ, কোরো
শিশুর সুরেই তাঁর কাছে প্রার্থনা :
'পথ চিনি না, হাত আজ আমার ধোরো
পায়ে টেনে নাথ, দিও সান্ত্বনা।'

তাঁকে আপন হ'তে আপন জেনে
করলে বরণ চিরসাথী ব'লে
পরও আপন হয়—নাও তাই মেনে
না দেখেও তাঁকে অশ্রুজলে।

নয় তো কৃপার অঘটন অসার
যার মায়াজাল বোনেন সে-মায়াবী।
মায়া তরি' চাইলে চরণ তাঁর
মিলবেই তাঁর প্রেমমহলের চাবি।

---

* সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, কবি, সাহিত্যিক, গ্রন্থকার। পুনা হরিকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর'

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী*

মনের ভারি দুঃখ কেউ চায় না তাকে।
পৃথিবীতে এত মানুষ
চরাচর সকলের এতটুকু বুকে
ঈশ্বর রেখেছেন এক সীমাহীন মন—
অন্তহীন আকাশের মত তার অনন্ত জীবন—
কিন্তু তারা তার থেকে এতটুকু দেয় না কাকে।

মন খোঁজে ঈশ্বরকে—জিজ্ঞাসা করবে।
কিন্তু কেউ তো দেখতে পায় না তাঁকে।
শুনতে পায় না তাঁর কথা—।
কিন্তু তিনি তো অন্তর্যামী
মনে মনে মনকে বললেন তাঁকেও কেউ চায় না। কিছু দেয় না।

হে ঈশ্বর, তাই তোমারো অসীম আকাশ ভরে অত দুঃখের দীপ জ্বালা!
চাওয়া না পাওয়ার অসীম বিরহ,—
কার পথ চেয়ে জ্বেলে রাখে অত তারা শশী গ্রহ!
কোন্ মনকে পাবার আশায় অন্তর্যামী ?
তবে তোমাকেই উৎসর্গ করবে মন তার মনের 'আমি'।

---

* সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকা। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল বাংলা সাহিত্যের সেবিকা। ১২টি গ্রন্থের লেখিকা। 'সোনা রূপা নয়'—গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিতা।

কেন করি

শ্রীশিবশম্ভু সরকার*

তোমারেই করি নমস্কার—
হেতু তার ?
আমারে দিয়েছ এই সুন্দর ভুবনে
আলো আঁধারের রঙে স্বপ্ন-নিকেতনে
এত ফুল, এত তারা
উচ্ছল নদীর বুকে বাজিছে উদারা—
মোর তরে মেঘে মেঘে হেসেছে তপন—
বর্ণালীর ইন্দ্রধনু—মুগ্ধ অগণন—
ধরণীর ধূলি মাঝে করেছ সঞ্চার
সুন্দরের চির অভিসার—
এরি তরে করি নমস্কার ?
কে সে কহে—'এহ বাহ্য, আগে কহ আর !'

সুখে দুখে লাগে দোলা
প্রেমের অধরে জাগে ব্যথার পেয়ালা
বুকে যে নিশ্বাস জ্বলে
নেবে সে আঁখির জলে
খেলে যে নাগরদোলা জীবনে মরণে—
মেরু মরু দুই জন রুদ্ধ আলিঙ্গনে !
অধ্রুব এ অনিশ্চিত
হৃদয়ের মধু গীত
ফেলে যাওয়া-পথচলা রাগিণী বাহার—
এরি তরে করি নমস্কার ?
কে সে কহে—'এহ বাহ্য, আগে কহ আর !'

---

* প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ (নৈশ বিভাগ), কলিকাতা। কবিতা ও প্রবন্ধাদি রচনার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যসেবী।

তুমি যে দিয়েছ অধিকার
তোমারে করিতে অস্বীকার—
তোমারে সমুখে রেখে শান্ত শিব জানি
কামনার ভোগবহ্নি নিত্য সত্য মানি
প্রজ্বলিত করি
চিতা আপনারি
ধূমায়িত আপনাকে করি আবিষ্কার—
মোর হাতে এইমাত্র তব পুরস্কার!
অজ্ঞানের দৃপ্ত অস্বীকারে
সর্বেশ্বরে তুচ্ছ করি উদ্দাম সোচ্চারে
কণ্ঠে তুলি বিদ্রোহ হুঙ্কার—
তব হাতে এই মোর শ্রেষ্ঠ অধিকার।
তোমা তাই—করি নমস্কার।

তুমি আছ

শ্রীশান্তশীল দাশ*

তুমি আছ, তুমি আছ—
এই কথাটি বারেবারে
বাজবে কবে দিবসনিশি
জীবনবীণার তারে তারে।

ডাইনে বামে সমুখপানে,
উর্ধ্ব অধ—সকলখানে
দেখবো তোমার মূর্তিখানি
আলোয় এবং অন্ধকারে।

অনেক দূরে পাহাড়চূড়ায়,
বদ্ধ ঘরে মন্দিরেতে
আছ তুমি, তোমার দেখা
পাব গেলে সেইখানেতে—

সত্য সে কি! নয়তো সে নয়,
আছ তুমি এ বিশ্বময়,
ব্রহ্ম হতে তৃণ কণায়—
দেখতে যে চাই সকল ধারে।

---

* শিক্ষাব্রতী সুপ্রসিদ্ধ কবি ও আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার। রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম: 'জীবনায়ন', 'পরিক্রমণ', 'একটি প্রসন্ন সুর', 'তোমায় কী দিয়ে বরণ করি', 'তুমি মহাত্মা', হে মহাজীবন', 'শবরী পৃথিবী জাগে' এবং 'অপরূপা'।

অপূর্ণতা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক*

পূর্ণের পটে অপূর্ণতার কতই-না তুলি আঁচড় কেটে চলে
নানান ছলে বলে—
সাগর শুধু ঢেউয়েই বুঝি ঢেউয়েই যেন ফেনার রেখা এঁকে
বালির তটে খেলার মোহে থাকে কি আর জেঁকে ?

আসছে কত আসছে কত দেখতে লাগে মজা
জাগছে শুধু ফেনার পরে ফেনার ওঠা-পড়া—
নিতান্ত এক চড়া
মেজাজ নিয়ে থাকলে তবু ভাবতে ভালো মজা।

আজকে যদি দেখলে চোখে যেটুকু যার কালো
ভাবনা থেকে ভালো—
দূরের পথে দূরের পথে হটিয়ে দিয়ে চলতে থাকা যায়
নিশ্চয় জানি ফুলের শোভা মানতে কেন চায় !

কারণ বুঝি চোখের দেখা মনের দেখা হলে
নিজের মতো হাজারো খুশি দলে—
হারিয়ে যাবে অচেনা দরবারে,
নিজস্ব রূপ স্বরূপ বুঝি থাকবে না সংসারে।

---

* সম্পাদক, সাহিত্যতীর্থ। সুপ্রসিদ্ধ কবি। 'মিষ্টিমন', 'আকাশ পিপাসা', 'ললিত লাবণ্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের লেখক ও ঔপন্যাসিক।

সাধনা

শ্রীবীণাপাণি ভট্টাচার্য

ভৈরবীতে তান ধরেছি
শেষ যেন হয় পুরবীতে।
তোমার পূজা করতে দিও
জীবনভরা মধুর গীতে।

রামকৃষ্ণ নামটি শুধু
সুরের মাঝে রইবে বাণী,
রাগ অনুরাগ এক হয়ে মোর
তোমায় পাশে আনবে টানি।

নাম ও নামী

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

নামের সমুদ্রে নামো—ঝাঁপ দাও তরঙ্গ-সংকুল
অসীম অনন্ত নীলে
অতল গভীরে।
বৈখরী শব্দের ঢেউ জলের উপরে খেলা করে
সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা জ্যোতি-আবরণে
উজ্জ্বল আড়াল গড়ে—
সেখানে থেমোনা।
ডুবে যাও, ডুবে যাও—যে তিমিরে
ঢেউ থেমে গেছে,
অবাক বিস্ময়ে দেখো শব্দ, ভাব
ক্রমে একাকার
মধ্যমার গুঞ্জরণে। শব্দ ছিলো
স্থূল জড়ত্বের
আবরণে বিজড়িত, ভাব তার কোমল আঙুলে
গায়ে রেখা মুছে মুছে
স্নিগ্ধতর ছবি এঁকে রাখে।
এখানেও শেষ নয়—অনিবার্য স্রোতের গতিতে
আরও নীচে যেতে হয়—
শব্দ ক্রমে জ্যোতির আভাসে
উদ্ভাসিত প্রতিমায়—
পশ্যন্তীর চকিত প্রকাশ!
তখন নামের মধ্যে জ্যোতির্ঘন চৈতন্য-স্বরূপ
স্বর্ণাভ কমলে সূর্য
আলোকিত, অভিন্ন, নিবিড়!
শব্দের অন্তিম পর্বে যদি নামো
অব্যক্ত, অরূপ
ধ্বনিহীন, দৃশ্যহীন পরা বাক্
অমূর্ত ব্যঞ্জনা।
নাম নামী সে জগতে বাক্যমনাতীত
পরমেশ-কৃষ্ণ-নীলিমায়
সৎ-চিৎ-আনন্দ ঝঙ্কার!

মাতৃসঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত*

বিধিপ্রদত্ত সহজাত সুকণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন মাতৃসংগীত পরিবেশন করে গিয়েছেন। ভক্তিসঞ্জাত আলাপ ও রঙ্গরসের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মধুভরা কণ্ঠে মাতৃসংগীত উচ্ছ্রিত হয়ে উঠত। যেখানেই গান হত, সেখানেই যেতেন তিনি। গোপাল উড়ের[1] দলকে তিনি একবার বলেছিলেন, 'তোমরা শেষে কিছু ঈশ্বরীয় গান বল।' ভক্তির আত্মনিবেদনে যাঁর জীবন সত্তা পরিপূরিত, ঈশ্বরভাবের গান না হলে যে তাঁর অন্তর ভরে না। ভক্তি-প্রদীপের তেল যোগাতে যে হয় ঈশ্বরভাবের গানের দ্বারাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামাসংগীতই ছিল একান্তভাবে অন্তরের গান, মর্মলোকের স্তবস্তুতিপূর্ণ আশা ও অভিমানভরা ভাব-প্রকাশের সুরময় ব্যঞ্জনার বাহন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথি রায়ের রচিত শ্যামাসংগীতই বেশি তিনি গাইতেন। কথা বলতে বলতে ভক্তিময় ভাবের আবেগে উপস্থিত গায়ক-ভক্তদেরকেও তিনি গাইতে বলতেন। নরেন্দ্রনাথকে (পরে বিবেকানন্দ) অনেক সময়েই দেখা যেতো ভক্তসমাবৃত শ্রীরামকৃষ্ণকে অবিশ্রামভাবে গান গেয়ে শোনাতে। কৃষ্ণযাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের 'কত্তাদনে হবে সে-প্রেম সঞ্চার' গানটি কয়েকবারই তিনি ঠাকুরকে শুনিয়েছেন। নীলকণ্ঠের গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সংগীতও শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার শুনেছেন। ভক্তিরসের সঙ্গে সংগীতরসের প্রগাঢ়তা মিশে তাঁর অন্তরলোককে দিব্যরসের অপার্থিবতায় পূর্ণ করে দিত। পূর্ণতার আধারকে সুপবিত্রতার ঢেউ এসে উদ্বেল করে তুলত।

শারদীয়া মাতৃসংগীতেও তাঁর ভক্তিময় আনন্দানুভূতি উছলে উঠত। যখন তিনি সখী বা দাসীভাবে ভাবিত হয়ে স্ত্রীজনোচিত বেশভূষায় সজ্জিত থেকে দিন কাটাতেন, তখন রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর অন্তঃপুরে গিয়ে দুর্গাপূজার সময়ে অন্দরের স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে বাইরে এসে প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে চামর-বীজন করতেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা মনে করতেন তিনি যেন তাঁদেরই একজন। আরাধনার একাগ্রতায় ও ভাবের একাত্মতায় এমনি করেই ঠাকুর শুধু নিজেকে ভুলতেন না, অপরকেও ভুলাতেন। পরম সম্পদের ধ্যানে নিজেকে ভোলা ও অন্যকে ভোলানোই তো অবতারপুরুষের শ্রেষ্ঠ লীলা। এই লীলার মাধুর্যই শারদীয়া দুর্গাপূজায় প্রতি বছর নতুন ভাবে দেখা দিত ঠাকুরের জীবনে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর সেদিন।

---

* বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, শ্যামসুন্দর কলেজ, বর্ধমান। কাব্যগ্রন্থ 'মধুমঞ্জরী' ও 'বনবাঁশরী' এবং 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়', 'বাংলা সাহিত্যের রূপচিত্র', 'বঙ্কিমসাহিত্যপরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

১ গোপাল উড়ে (১৮১৯-১৮৫৯) বিদ্যাসুন্দরপালা গেয়েই বাংলা দেশে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী তিথি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধরলাল সেনের বাড়ীতে ঠাকুর তিন দিনের জন্যই আমন্ত্রিত হয়েছেন। অধরলালের বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে তিনি রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে গিয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীম, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, চুনিলাল, নরেন্দ্র প্রভৃতি একান্ত ভক্ত ও অনুরাগিগণ। এর দুদিন পূর্বে সপ্তমী পূজার প্রথম ভাগেই অধরলাল সেনের বাড়ীতে আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। অষ্টমী পূজার দিন রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী হয়ে অধরলাল সেনের বাড়ীতে যাবেন। জগন্মাতার কৃপালালিত বালক তিন-দিনের এই শারদীয় পূজার মহোৎসবে না এলে কিছুতেই পরম আনন্দের আস্বাদ পান না। ভক্তজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ ভক্তিমূলক আলোচনার পরে একবার বিশ্বজননীকে কিভাবে কাছে টেনে আনতেন, তা-ই সারল্যের সাবলীলতায় অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। নিঃসংকোচে ঠাকুর বললেন, 'কি অবস্থাই গেছে! মুখ করতুম আকাশ-পাতাল জোড়া, আর "মা" বলতুম্। যেন মাকে পাকড়ে আনছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড় হড় করে টেনে আনা।' বলতে বলতেই উন্মাদনাময় ব্যাকুলতায় ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন, 'এবার কালী তোমায় খাব।' সুকণ্ঠে নরেন্দ্রনাথ গান ধরলেন, 'আমায় দে মা পাগল করে আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।' জন্মসিদ্ধ গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব স্বরশিল্পের মাধুরী প্রথমে ঠাকুরের অন্তরের গভীরে এনে দিল আত্মানন্দ-ময় ভাবতন্ময়তা, তার পরেই টেনে নিয়ে গেল সমাধির কোন্ মহাগভীরতায়! এ যেন মাতৃ-বিভূতির এক মহিমময় প্রকাশ। কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর ফিরে এলেন সমাধিভঙ্গের বাস্তব পরিমণ্ডলে। কিন্তু বস্তুজগতের রূপৈশ্বর্যের মধ্যে ফিরে এলেও তাঁর হৃদয়জোড়া ভাবাবেশ যাবে কোথায়? পরক্ষণেই ঠাকুর নিজেরই উপর যেন গিরিরানীর ভাব আরোপ করে দেবীর আগমনী গান গেয়ে উঠলেন,—'পুরবাসীরে আমার কি উমা এসেছে?' বাৎসল্যের ব্যাকুলতায় ঠাকুরের কণ্ঠস্বর স্নেহস্পন্দিত। আন্তরিক প্রত্যয়ে ঠাকুর ভক্তদেরকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডেকে বলছেন, 'আজ মহাষ্টমী কি না; মা এসেছেন। তাই এত উদ্দীপন হচ্ছে।' যাঁর অন্তরের বীণার তারে প্রতিদিনই মায়ের আগমনী গানের সুর বাজে, তাঁর বুকের দেউলে মহাষ্টমী তিথিতে আগমনীর আশা-ভরা উদ্দীপনের প্রদীপ তো জ্বলবেই। মা শুধু কি শারদীয় পরিবেশেই প্রতিভাত হয়েছেন, ঠাকুরের অন্তর-মন্দিরেও তাঁর যে মহা আবির্ভাব ঘটেছে।

শ্রীম কেবল ঠাকুরের কণ্ঠাশ্রিত আগমনী গানের প্রথম ছত্রটিরই উল্লেখ করেছেন। সুদীর্ঘকাল পুরো গানটি বহু অনুসন্ধান করেও খুঁজে পাইনি। এক সময় আমাদের দেশে প্রচলিত আগমনী ও বিজয়া-সংগীত সংগ্রহ করতে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলাম। বাউল-বৈষ্ণবদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অথচ তেমন ভাবে প্রচলিত নয়, এমন কয়েকটি আগমনী গান সংগ্রহ করতে সক্ষমও হয়েছিলাম। সেগুলির মধ্যে উপরি-উক্ত ঠাকুরের কণ্ঠে গীত প্রায় অবিকল প্রথমছত্রযুক্ত একটি আগমনী গান বর্ধমানবাসী ফকিরদাস বৈরাগীর নিকট প্রায় দশ বৎসর পূর্বে পেয়েছিলাম। এই আগমনী-সংগীতটিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গেয়েছিলেন কি না ঠিক বলা যায় না, প্রথম ছত্রটি প্রায় একরূপ বলেই পুরো গানটিই এখানে উদ্ধৃত করলাম।

গানটির কোনো ভনিতা নেই,—বৈরাগী-গায়কের কাছে বহুবার জিজ্ঞেস করাতেও তিনি গানটি কার রচনা বলতে পারেননি, এবং গানটি আরও দীর্ঘ ছিল কিনা সে-বিষয়েও তিনি কোনোরূপ আলোকপাত করতে পারেননি। বাঙালীর গান (১৩১২ সাল) ও 'সংগীতসার-সংগ্রহে'ও (১৩০৬ সাল) এই গানের সন্ধান পাওয়া যায় না।

পুরবাসীরে, বল তোরা আমার
উমা কি এসেছে ?
সঙ্গে কি তার পাগল জামাই
ছেলেপুলে এনেছে ?
শুনেছি তো জামাই আমার,
ভস্ম মাথে অঙ্গেতে তাঁর,
এখনো কি ছাই ভস্ম
অঙ্গে লেগে রয়েছে ?
কতদূরে দেখলি উমায়,
চল্ রে সবাই দেখিগে, আয়,
এক বছরে মায়ের আমার
কি রূপ জানি হয়েছে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই বলরামের বাড়ীতে বৈষ্ণবচরণ ও বেনোয়ারীর কীর্তন দেওয়া হয়েছিল। বৈষ্ণবচরণ যখনই গাইলেন—

শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার,
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার।

নিপুণ গায়কের কণ্ঠে দুর্গানামের মধুর সুর-লহরী শুনে ঠাকুর মুহূর্তের মধ্যে সমাবিষ্ট হয়ে গেলেন। মাতৃভাবের সুধাধারায় হৃদয় সিঞ্চিত হলে অতল গভীরে স্বতঃই ডুবে যায় দিব্যপুরুষের চেতনা।

১৮৮৫ সালের ১১ই মার্চ বলরামের বৈঠকখানা ঘরেই ঠাকুর বিভিন্ন ভক্ত, গায়ক, সুরেশ মিত্র, শ্রীম, নাট্যকার গিরিশ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে বসে আছেন। তারাপদ গিরিশ ঘোষ-রচিত 'কেশব কুরু করুণা দীনে' গানটি গাইলেন। পরে অন্য গায়ক নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সংগীতও পরিবেশন করলেন। ভক্তিভাবের অপরূপ সংগীতময় পরিবেশ রচিত হল অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বৈঠকখানা ঘরটিতে। নারায়ণ নামে একজন ভক্ত হঠাৎ ঠাকুরকে বলে বসলেন, 'আপনার গান হবে না ?' ঠাকুর তাঁর ভক্তি-বিগলিত কণ্ঠে প্রথম একটি শ্যামাসংগীত পরিবেশন করেই আনন্দময়ী-জগজ্জননী-দুর্গা-বিষয়ক গানে মেতে উঠলেন। ঠাকুরের অমৃতভরা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল—

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায়
নিরানন্দ করো না।
(ওমা) ও দুটি চরণ বিনে আমার মন,
অন্য কিছু আর জানে না।
তপনতনয় আমায় মন্দ কয়,
কি বলিব তায় বল না,
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে,
মনে ছিল এই বাসনা।
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা)
স্বপনেও আমি জানি না,
আমি অহর্নিশি শ্রীদুর্গানামে ভাসি,
তবু দুঃখরাশি গেল না।
এবার যদি মরি ও হরসুন্দরী,
তোর দুর্গানাম কেউ লবে না।

ঠাকুর এদিন বলেছিলেন সর্দিতে তাঁর গলা ভাল ছিল না। কিন্তু চির-আনন্দময়ী দুর্গতিহরা শ্রীদুর্গার সংগীতে ভক্তিমাধুর্যমণ্ডিত অন্তরের যে-ভাবধারা নিঃসৃত হয়েছিল তা সেদিনকার উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে নির্বাক বিমুগ্ধতায় বহুক্ষণ স্তব্ধ করে রেখেছিল। ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা ভাব, তাঁর গীত

প্রতিটি গানের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠত। সুরেন্দ্র মিত্রের ভবনে এর দুই বৎসর পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক এই দুর্গা-বিষয়ক সংগীতটিই তাঁর দিব্যকণ্ঠে ভাববিহ্বল হয়ে পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন।

বল রে শ্রীদুর্গানাম।
নমো নমো নমো গৌরী, নমো নারায়ণী!
দুঃখী দাসে করো দয়া, তবে গুণ জানি।
যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে।
অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীদুর্গা বলে
ডাকে।
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব,
বাজন নূপুর হয়ে মা তোর চরণে বাজিব

* * *

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, যেবা পথ চলে যায়,
শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়।

এই দুর্গা-সংগীত শুনিয়ে যেদিন ঠাকুর উপস্থিত সকলকে ভক্তিরসে মগ্ন করেছিলেন সেদিন ছিল শারদীয় দুর্গাপূজার নবমী তিথি (১৮৮৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর); ঐ দিন শ্রীম, ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তগণ খুব ভোরে চোখ খুলেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঠাকুরের দিব্য বালক-ভাব। ঠাকুরের কটিদেশে কাপড় নেই, আশ্চর্য সুন্দর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে 'জয় জয় দুর্গে!' 'জয় জয় দুর্গে!' সংকটনাশিনী দুর্গা-নামের অবিরাম জপধ্বনিতে বালকভাবের যে-পবিত্র রূপমূর্তি সেদিন মাতৃসাধক ঠাকুরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেদিন যে প্রত্যক্ষদর্শীরা তা লক্ষ্য করে ধন্য হয়েছিলেন, প্রায় শতাব্দীকাল পরেও আমরা কল্পনা-দৃষ্টিতে দর্শন করে যেন ধন্য হই। মাতৃ-সাধনার এই দৃশ্য বাংলা দেশেরই একটি পবিত্র মন্দির-অঙ্গনে রূপময় হয়ে উঠেছিল ভেবে আমাদের অন্তরাত্মা পরমতম তৃপ্তি লাভ না করে পারে না। দিব্যাত্মার এ এক দুর্লভ ভক্তিমাখানো অক্ষয় রূপমূর্তি। বলা বাহুল্য সেদিনকার প্রত্যক্ষদর্শীরা পূর্বদিন রাত্রিতে ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় থেকে গিয়েছিলেন। এর প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে সুরেন্দ্র মিত্রের ভবনে, চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ৺অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে ঠাকুর উপরি-উদ্ধৃত দুটি দুর্গা-সংগীতই অপূর্ব মধুর কণ্ঠে পরিবেশন করেছিলেন। (১৮৮৩, ১৫ই এপ্রিল)। আনন্দময়ী মাকে ঠাকুর ভক্তির আবেগভরা আনন্দে গানের মধ্য দিয়ে না ডেকে কিছুতেই শান্তি পাননি। ভক্তি-সাধনার অদম্য প্লাবনধারা সুকণ্ঠের সুরের পথ দিয়ে ভক্তগণের হৃদয়ক্ষেত্রে বইয়ে না দিয়ে যুগপুরুষের অন্তরে কিছুতেই তৃপ্তি আসে না। তৃপ্তি পাওয়াতে এসেই তো তাঁর সীমাহীন ব্যাকুলতার দৃশ্য দেখানো। এই দৃশ্য দেখিয়ে ও পরম সত্যের পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার।

তৎকালীন অসাধারণ উত্তুঙ্গব্যক্তিত্ব পুরুষদের অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেখা করতে গিয়ে বিভিন্নরূপ আলাপ-আলোচনার পর বিদ্যাসাগরের অন্তরের কি ভাব জানতে চেয়েছিলেন। (১৮৮২, ৫ই আগষ্ট) বিদ্যাসাগর উত্তরে বলেছিলেন, সে-কথা তিনি তাঁকে একাকী নির্জনে একদিন বলবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে শুধু বলেছিলেন, 'তাঁকে পাণ্ডিত্যের দ্বারা বিচার করে কিছু বলা যায় না।' এই বলেই ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হয়ে রামপ্রসাদের এক বিখ্যাত শ্যামাসংগীত গেয়ে উঠেছিলেন,—'কে জানে কালী কেমন, ষড়-দর্শনে না পায় দরশন।' এর পরেই ভক্তি ও

বিশ্বাস সম্বন্ধে বলতে বলতে এক অনির্দেশ্য ভাবোন্মত্ততার আবেগে মগ্ন হয়ে গেয়ে উঠলেন দশভুজা দুর্গারূপিণী জগজ্জননীর এক অপূর্ব সংগীত :

আমি 'দুর্গা দুর্গা' বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী,
এ-সব পাতক, না ভাবি তিলেক,
ব্রহ্মপদ নিতে পারি।

দুর্গতিহরা মায়ের সংগীতের মধ্য দিয়ে আন্তরিক ভক্তি-বিশ্বাসের এক আনন্দময় সুর সেদিন দিব্য পুরুষের কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল বাংলা দেশের এই দয়ার্দ্রচিত্ত প্রখ্যাত পুরুষের সম্মুখে। ঠাকুর বলেছিলেন, সেই বহুখ্যাত সুপণ্ডিত পুরুষটির অন্তরে সোনা আছে, কিন্তু তিনি খবর পাননি—একটু মাটি চাপা রয়েছে সেই সোনা। অক্ষয় সোনার ঝিলিক যাঁর নয়নে, তিনি তো এই সত্য কথাটি বলবেনই। আবার বিদ্যাসাগরের ভেতরকার শক্তির কথাটিও বলেছিলেন। শক্তিমান পুরুষের সাত্ত্বিক কর্মের উজ্জ্বলতাও অমৃতপুরুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তারও উল্লেখ করেছিলেন তিনি। প্রথমে এসেই বিদ্যাসাগরকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।' আসল রসের রসিক-পুরুষের স্নিগ্ধ নির্মল রসিকতায় উপস্থিত সকলে হেসে উঠেছিলেন। সমবেত হাস্যরোলের মধ্যেই বিদ্যাসাগর কৌতুক-সরস কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।' তিনি যে নোনা জল নন ঠাকুর তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।' শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর ক্ষীরসমুদ্র। আমাদের মনে হয় বিদ্যাসাগরের দিক থেকে কৌতুকভরা নোনা জলের উত্তর আসাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সুরেলা কণ্ঠে দুটি শ্যামাসংগীত ও একটি শ্রীদুর্গা-বিষয়ক সংগীত শুনিয়ে তাঁর উপর চিরনির্মল ভক্তির গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। মহাকাল তাঁর সেই মাতৃসংগীতের লাবনি-ধারা অবারিত গতিতে বুকে বহন করে নিয়ে চলেছে। যুগযুগান্তরের পথিক যাত্রী সেই ভক্তি-আশ্রয়ী সুর-সুরধুনীর পবিত্র কল্লোল-ধ্বনি শুনে ধন্য হচ্ছেন।

সেই সময়কার ভক্তসাধক কীর্তিমান কৃষ্ণ-যাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১৮) একদিন ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে গান শুনাতে এসেছিলেন (১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর)। এর পূর্বে ঠাকুর বহুবার নীলকণ্ঠের গান শুনেছিলেন। এবার নীলকণ্ঠ তাঁর দলের পাঁচ সাতজন লোককে সঙ্গে নিয়ে এসে মোট চারটি গান ঠাকুরকে শুনিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমেই নীলকণ্ঠ এসে ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। নীলকণ্ঠ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ঠাকুরের আকস্মিক এই ভাবাবিষ্ট রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে ঠাকুরের ভাব উপশমিত হলে নীলকণ্ঠের সঙ্গে কিছুক্ষণ আধ্যাত্মিক আলোচনার পরে ঠাকুর নীল-কণ্ঠের কাছে মায়ের নাম শুনবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন। নীলকণ্ঠ তাঁর সঙ্গীগণকে নিয়ে অপূর্ব কণ্ঠে স্বরচিত গান গেয়ে উঠলেন,—

শ্যামাপদে আশ নদীর ধারে চাষ
ভাবনা বারো মাস ঘোচে না ঘোচে না,
কৃপাশস্য কবে হবে কি না হবে
তাহার নিশ্চয় কেউ জানে না।[২]

২ গানটির পূর্ণাঙ্গরূপ মৎপ্রণীত 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এরপরেই নীলকণ্ঠ গেয়েছিলেন :

মহিষমর্দিনী মাতা শরতে ভুবনে আসে,
দেখে অতসী-বরণারূপ আনন্দে জগত ভাসে।[৩]

তারপর ক্রমান্বয়ে শিব-বিষয়ক একটি সংগীত (শিব শিব বল মন অশিব হইবে নাশ) এবং ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী নীলকণ্ঠের বিখ্যাত গান 'শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়' গান দুটি উপস্থিত সকলের মনে অভূতপূর্ব মুগ্ধতা সঞ্চার করে পরিবেশিত হয়েছিল। এরপর ভক্তির মাধুর্যলীলা সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনার পর নীলকণ্ঠকে 'তবে একটা গান শোনো' বলে ঠাকুর নিজেই গিরিরাজের প্রতি মেনকার বাৎসল্যভরা আবেদনসূচক একটি সুন্দর গান শুনিয়েছিলেন :

গিরি! গণেশ আমার শুভকারী।—
পূজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী
যাও হে গিরিরাজ আনিতে গৌরী॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।
ঘরে আনবো চণ্ডী ; শুনবো কত চণ্ডী,
কত আসবেন দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥

কোজাগরী পূর্ণিমার পরের দিনের জ্যোৎস্নাপুলকিত সন্ধ্যায় ঠাকুরের জন্মগত মধুর কণ্ঠে আগমনীসূচক এই গানটি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিজের ঘরটির পশ্চিমের গোল বারান্দায় পরিবেশিত হয়ে যে অপার্থিব ভক্তিস্নিগ্ধ পরিবেশ গড়ে তুলেছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। প্রান্তবাহিনী ভাগীরথীবুকের নৌকাযাত্রিগণ এই অপরূপ ভক্তি-সংগীতের মাধুর্যধারায় অভিসিঞ্চিত হয়েছিলেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত দিনান্তের এই বুক-জুড়ানো পরিবেশে ঠাকুর নিজের কণ্ঠে 'হৈমবতী'-কথাযুক্ত উপরি-উক্ত গানটি গেয়ে কৌতুকমধুর কণ্ঠে হাস্যরসের ছটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে শ্রীম, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি, এঁদের (যাত্রাওয়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্ছি।' নীলকণ্ঠ সকৃতজ্ঞভাবে এই কথাগুলির উত্তরে বলেছিলেন, তাঁরা যে গান গেয়ে বেড়ান, তার পুরস্কার আজ পরিপূর্ণভাবে পেলেন। যে-যুগাবতার তাঁর ভক্তিভাবসমৃদ্ধ ও জ্ঞানপ্রোজ্জ্বল জীবন দিয়ে পথহারা মানুষকে পথ দেখাতে এসেছেন, তিনি যে তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত মাতৃ-সংগীত ভক্ত সাধককেও শুনিয়ে ধন্য ও তৃপ্ত করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মর্ত্যভূমিতে মৃন্ময়ীরূপে পূজিতা জগজ্জননী শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মচেতনায় চিন্ময়ীরূপের জ্যোতির্বিভাসনে সমস্ত খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড-ভাবকে একটি পরম ঐক্যসূত্রে বিধৃত করে দিয়েছিলেন। সেইজন্যই তিনি আপ্লুত ভক্তিতে অতিলৌকিক ভাবাবেশে অধরলাল সেনের বাড়ীতে দুর্গাপূজার মহোৎসবের দিনে (১০ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খ্রীঃ, ২৪শে আশ্বিন, ১২৯০ বঙ্গাব্দ) বহু ভক্তজনের সমক্ষে সর্বসমন্বয়ী-দৃষ্টিতে জগন্মাতার স্তবগান করে, মহারাজ নন্দকুমার রচিত ও রামপ্রসাদ রচিত দুটি শ্যামাসংগীত তাঁর অমৃতক্ষরা কণ্ঠে পরিবেশন করে, রামপ্রসাদের আর একটি মাতৃসংগীত আবেশ-বিভোর কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন :

অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি,
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।
কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।

---

৩ লেখকের পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম
কিনে এনেছি ॥
দেহের মধ্যে ছজন কুজন তাদের ঘরে দূর
করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে, দেখাব তাই
বসে আছি ॥
কালীনাম-মহামন্ত্র আত্মশির শিখায়
বেঁধেছি
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে
বসে আছি ॥

কখনো মাকে যে কিভাবে ডাকতে হয় ভক্তগণকে ঠাকুর শিখিয়ে দিতেন এইভাবে,—'আমি মা বলে এইরূপে ডাকতাম—"মা আনন্দময়ী! দেখা যে দিতে হবে।"' সাধকভাবের আবিষ্টতায় মগ্ন হয়ে কখনো বলেছেন, 'হরগৌরীভাবে কতদিন ছিলুম।' হরগৌরীভাব অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতিভাব, সাধনার সমুচ্চ উত্তরণে নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় শক্তির অখণ্ড প্রকাশ। সাধকজীবনে মাতৃরসে মগ্ন থেকে নিজের মধ্যে এই অখণ্ডভাবকে অনুভব না করে পারেন নি ঠাকুর। গৌরীকে ডেকেছেন একবার আগমনী-সংগীতে, আর অন্যবার হরকে গৌরীর সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন সমগ্র-সত্তায়।

ঠাকুরের সাধনা যেমন সমাধির আপন-হারানো অতলে ডুব দেওয়া ধ্যানের মধ্য দিয়ে, কখনো বা 'মা আমাকে দেখা দিলি নি' বলে অবিরল ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার পথে যেতে চেয়েছে, তেমনি তাঁর সাধনার সত্য ভক্তগণের সঙ্গে অধ্যাত্ম-সংলাপে এবং কখনো বা সংলাপকে সুরের জগতে নিয়ে এসে সুকণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অবতীর্ণ ভগবান মাতৃভাবের সংগীত-পরিবেশনের ভাবমূর্তিতেই অক্ষয় রূপ নিয়ে আমাদের চিত্তলোকে চিরদিন জেগে রয়েছেন।

গিরিশের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ একটি বক্তৃতা

শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়*

১৮৯৭ সালের ২৫ জুলাই রামকৃষ্ণ মিশন এ্যাসোসিয়েশনের চতুর্দশ সভায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ভক্তগণের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এক-ঘণ্টাব্যাপী একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণের পর তাঁকে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়েছিল—তিনি সেগুলিরও যথাযথ উত্তর দেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে পাঠ করে শোনান। অনুমান করা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যমণ্ডলীর অনেকেই সভায় উপস্থিত থেকে গিরিশের অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তৃতা শোনার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, তবে স্বামী বিবেকানন্দ সে সভায় ছিলেন না কারণ তখন তিনি আলমোড়ায়।

মূল বাংলা বক্তৃতাটি মিশনের সভার কার্যবিবরণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এ-যাবৎ অপ্রকাশিত।† মূল বাংলা থেকে ইংরেজীতে

---

* কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থের রচয়িতা।

† রামকৃষ্ণ মিশন এ্যাসোসিয়েশনের ১৮৯৭ সালের ২৫শে জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী বর্তমানে এরূপ জীর্ণদশায় আছে যে, মূল ভাষণটি সেখান হইতে উদ্ধার করা আপাততঃ সম্ভব নহে। ভবিষ্যতে সম্ভব হইলে উহা উদ্বোধনে প্রকাশিত হইবে। —সঃ

তর্জমা করেন স্বামী বন্দনানন্দ এবং সেটি Vedanta and the West-এর ১৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানত সেই অনুবাদ এবং মূলের সামান্য অংশ অবলম্বন করে বক্তৃতাটির বৈশিষ্ট্য এবং তার মধ্যে নতুন সংবাদগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

বক্তৃতার প্রারম্ভে গিরিশচন্দ্র বলেছেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের ওপর নির্ভর করেই, তিনি ভাষণ দিতে অগ্রসর হয়েছেন। বক্তৃতার শেষে তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ : শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের প্রতিমূর্তি এবং আমাদের অন্তরের শাসনকর্তা। আমরা যদি তাঁর ওপর নির্ভর করি তাহলে সমস্ত অজ্ঞানতা ও অবিচার থেকে মুক্তিলাভ করব।

গিরিশচন্দ্রের এই বক্তৃতায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শের কিছু নতুন সংবাদ পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আশ্রয় গ্রহণের চার পাঁচ-দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কিছু পেয়েছেন কি না! উত্তরে গিরিশচন্দ্র জানান, তিনি পেয়েছেন ভয় থেকে মুক্তি। শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ হেসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণের পূর্বে গিরিশ নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁর সাহসিকতার পরিচয়ও অজানা ছিল না, কিন্তু জীবন সম্পর্কে এক অসীম শূন্যতাবোধ এবং গভীর হতাশা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। যে গিরিশ মনে করতেন যেখানে তিনি বসেন সেখানকার মাটি পর্যন্ত অশুদ্ধ, সেই গিরিশের সমস্ত শক্তি মানসিক ভীতির বেষ্টনে সঙ্কুচিত। রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে তিনি খুঁজে পেয়েছেন নিজের ওপর বিশ্বাস। তখনো তাঁর জীবনের কোনো আভ্যন্তর পরিবর্তন ঘটেনি কিন্তু একজন মানুষের ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করতে পেরেছিলেন যিনি তাঁর সমস্ত পাপবোধ ও অবিশ্বাসকে দূর করে তাঁকে আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করে তুলে-ছিলেন। মাত্র চার পাঁচদিনের মধ্যেই আত্মশক্তির এই জাগরণ গিরিশকে নবজন্ম দান করেছে। বিশ্বাসের এই অটুট শক্তিতেই তাঁর পরবর্তী জীবন এক নতুন প্রবাহে আবর্তিত হয়ে ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

'It is hard, therefore, to describe him ; even to form a concept or idea within oneself is difficult.'

গিরিশ সে-ধারণার চেষ্টা করেন নি— তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নিরিখে 'giver of shelter and protection'-রূপে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে রামকৃষ্ণ-চরিত্র পরিকল্পনার পটভূমিকা সম্পর্কেও কিছু সংবাদ তিনি পরিবেশন করেছিলেন। আমরা দেখতে পাই, 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে তিনি রামকৃষ্ণ-চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে পুরুষ-প্রকৃতি —এই দুই সত্তার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রে এই দুই সত্তার মিলন সুপরিজ্ঞাত, কিন্তু গিরিশচন্দ্র তা গ্রহণ করে-ছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। 'বিল্বমঙ্গল' রচনার এক বৎসর আগে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পানিহাটির উৎসবে যোগদান করেছিলেন। সেইদিন তাঁর বিস্মিতদৃষ্টির সম্মুখে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের এই দ্বৈত-সত্তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বক্তৃতার মধ্যে গিরিশ সেদিনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন :

উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, পানিহাটির উৎসবে আমি ঠাকুরের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাব দেখেছিলাম। সেই সময় থেকে, আমি বলতে পারি না তিনি পুরুষ না প্রকৃতি! তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি নিজেই জানেন না যে তিনি পুরুষ না প্রকৃতি!

পানিহাটি উৎসবের অভিজ্ঞতা যে গিরিশের মনে কতখানি রেখাপাত করেছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন এবং সন্দেহ নেই, সেদিনের ঘটনা ও শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের ভাবপরিকল্পনা।

গিরিশচন্দ্রের সেদিনের অভিভাষণে আরও একটি বিশেষ মূল্যবান সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। গিরিশের বক্তৃতা থেকে জানা যায়, 'বিল্বমঙ্গল' নাটক লেখার পর অনেকে তাঁকে নাটকটি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন। উত্তরে গিরিশ বলেছিলেন: 'নাটক লেখা তাঁর কাছে শেখা।'(১) 'বিল্বমঙ্গল' নাটক রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা ও পরামর্শ কতখানি কার্যকরী হয়েছিল তা আমরা জানি (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'উদ্বোধন' শারদীয়া ১৩৮৫ এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। 'বিল্বমঙ্গল' সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও নির্দেশনাগুলি গিরিশচন্দ্র ছাত্রের মত শিখে নিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী নাটক রচনা ও প্রযোজনা করেছিলেন। কিন্তু এখানে নাটকরচনায় শিক্ষালাভের কথা বলেছেন সাধারণভাবে—কোনো বিশেষ নাটক সম্পর্কে নয়। প্রকৃতপক্ষে গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনার কাল শুরু হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে আসার পর থেকে—বিশেষ করে 'বিল্বমঙ্গল' থেকে। এই কালেই তিনি রচনা করেছেন 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' প্রভৃতি—যেগুলি তাঁকে নাট্যকার হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে স্থাপন করেছে। সুতরাং গিরিশের নাট্যপ্রতিভার স্ফুরণে শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা ও পরামর্শ যে কতখানি মূল্যবান ছিল, তা তাঁর মুখ থেকেই আমরা জানার সুযোগ পেলাম।

আলোচ্য বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণের বহুমুখী শক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেছেন:

'নরেন্দ্র বলে, বিজ্ঞান তাঁর কাছে শেখা; মহেন্দ্র মাষ্টার বলেন, মাষ্টারী শেখা তাঁর কাছে; তাঁর যে কেমন ভাব কি বলিব?' (২)

শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষাজীবী মহেন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে সেই আদর্শ শিক্ষকের রূপকে খুঁজে পেয়েছিলেন অবশ্যই। তাই তাঁকে শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুরূপেই নয়, বৃত্তিজীবনের দিশারীরূপেও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যদর্শন ও বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন নরেন্দ্রনাথ যখন প্রথম রামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁর জড়বাদী বিজ্ঞানবুদ্ধিই শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণের পথে অন্তরায় হয়েছিল। গিরিশ-কথিত নরেন্দ্রনাথের উক্তি থেকে জানা যায় যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই যথার্থ বিজ্ঞান-শিক্ষা লাভ করেছিলেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শব্দটিকে আমাদের প্রচলিত ধারণায় দ্বারা সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের কাছে পেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। শ্রীরামকৃষ্ণের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন: 'চিকিৎসকেরা যেমন রোগীর চিকিৎসা বিভিন্নভাবে করেন, বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন তিনিও

তেমনি বিভিন্ন লোকের জন্য বিভিন্ন সাধনার নির্দেশ দিতেন।' (বাণী ও রচনা—শতবর্ষ সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪১৩)

স্বভাবতই এখানে মনোবিজ্ঞানের কথা এসে পড়ে। স্বামীজী মনোবিজ্ঞানকে 'সকল বিজ্ঞানের সেরা' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন :

'এ বিজ্ঞানের অতি অল্পই আমি জানি; কিন্তু যেটুকু জানি, সেটুকু শিখিতেই আমার জীবনের ত্রিশ বৎসর ধরিয়া খাটিতে হইয়াছে···কঠোর পরিশ্রম সহকারে ত্রিশ বৎসর খাটিতে হইয়াছে। কখন কখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা খাটিয়াছি, কখন কখন রাত্রে মাত্র এক ঘণ্টা ঘুমাইয়াছি, কখন বা সারা রাতই পরিশ্রম করিয়াছি; কখন কখনও এমন সব জায়গায় বাস করিয়াছি, যাহাকে প্রায় শব্দহীন, বায়ুহীন বলা চলে; কখন বা গুহায় বাস করিতে হইয়াছে। ··আর এ-সব সত্ত্বেও আমি অতি অল্পই জানি বা কিছুই জানি না; আমি যেন এ বিজ্ঞানের প্রান্তটুকু মাত্র স্পর্শ করিয়াছি। কিন্তু আমি ধারণা করিতে পারি যে, এ বিজ্ঞানটি সত্য, সুবিশাল ও অত্যাশ্চর্য।' (বাণী ও রচনা—শতবর্ষ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৪)

এ সুবিশাল বিজ্ঞানের প্রতি শৈশব থেকে স্বামীজীর আগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে তীব্রতর হয়েছে এবং তিনি যথার্থ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন সন্দেহ নেই।

আরও একটি দিক থেকে স্বামীজীর মন্তব্যটি দেখা যেতে পারে। স্বামীজীর মতে : 'একত্বে উপনীত হইলেই সব বিচার সমাপ্ত হয়, সুতরাং আমরা প্রথমে বিশ্লেষণ, তারপর সমন্বয় অবলম্বন করিয়া থাকি। বিজ্ঞানের রাজ্যে দেখা যায়, একটি অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধানে বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলি ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হয়। চরম একত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জড়বিজ্ঞান লক্ষ্যে উপনীত হয়। একত্বে পৌছিলেই আমাদের বিশ্রাম। জ্ঞানই চরম অবস্থা।

'সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞান বহু পূর্বেই সেই একত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, সেই অদ্বৈত-তত্ত্বে উপনীত হওয়াই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য।' (বাণী ও রচনা, শতবর্ষ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১১)

শ্রীরামকৃষ্ণই নরেন্দ্রনাথের 'সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান'-এর শিক্ষাদাতা। তিনিই তাঁকে অভিষিক্ত করেছিলেন অদ্বৈত-বেদান্ততত্ত্বের আলোকে। জড়বিজ্ঞানী নরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন 'যে বিজ্ঞান মানুষের অতীন্দ্রিয় সত্তার মধ্য দিয়া প্রকৃতির অতীত সত্তাকে বুঝিতে চায় তাহাকেই ধর্ম বলে।' (ঐ, পৃ: ৪২০)

শ্রীমতী লুই বার্ক লিখেছেন : 'Standing, as it were, on the ground of Advaita Vedanta the Swami taught it, everything found its justification and its meaning : the world of science and the world of religion, of reason and of faith, of gross matter and of the Personal God —all were harmonized as different readings of the one Reality.' (Prabuddha Bharata—April '79)

* * *

গিরিশের জীবনে পরিবর্তনের মূলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মন্তব্যগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার গভীরতাই যে গিরিশের মানস-বিপ্লবের ভিত্তি সে-কথা

তিনি অন্যত্র বলেছেন—এই ভাষণেও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—

আমার কখনো কোনো সত্যকার বন্ধু ছিল না কিন্তু তিনিই আমার সত্যকার বন্ধু কারণ তিনি আমার দোষগুলিকে গুণে পরিণত করেছেন। আমার মনে হয়, এক হিসাবে তিনি আমাকে আমার নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন।

এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের আর একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা :

আরো একটা জিনিস তাঁর মধ্যে দেখেছি ; যদি কেউ নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন হত এবং স্বীকার করত তাহলে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করত। তাঁর সংস্পর্শে এসে পাপীর অন্তরও পরশমণির স্পর্শে সোনা হয়ে উঠত। বিনীত ও অনুগত হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি পাপীকেও আশ্রয় দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে গিরিশ কিন্তু প্রথমে বিনীত ও অনুগত হয়ে আসেন নি, তবে আত্মদোষ প্রকাশে তাঁর কুণ্ঠাও ছিল না। সেই সূত্রেই তিনি পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অনাবিল স্নেহ—যা তাঁকে একান্তভাবে শরণাগত করে তুলেছিল।

সামগ্রিকভাবে এই দীর্ঘ আবেগময় ভাষণটি গিরিশচন্দ্রের সমকালীন ভক্তস্বরূপকে উজ্জ্বল করে তুলেছে :

উদ্ধৃতিসূত্র ও প্রসঙ্গসূত্র

(১) ও (২): গিরিশচন্দ্রের মূল বাংলা ভাষণের অংশ—স্বামী চেতনানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রচনায় ব্যবহৃত অন্যান্য অংশগুলি স্বামী বন্দনানন্দ অনূদিত ইংরেজীর বঙ্গানুবাদ। বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্রের ভাষার সঙ্গে এই বঙ্গানুবাদের পার্থক্য যথেষ্ট এবং সেই কারণে এগুলিতে উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহার করি নি।—লেখক।

বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাৎ

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু*

১

১৮৯২ সালের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ পুনায় লোকমান্য তিলকের বাড়িতে ১০-১২ দিন ছিলেন। উভয়ের সেই প্রথম পরিচয়। এই বিষয়ে কিছু বিবরণ 'বেদান্ত কেশরী'তে একদা বেরিয়েছিল (পরে সেটি 'রেমিনিসেনসেস্' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়)। তাছাড়া তিলকের 'ছাত্র' প্রহ্লাদ নারায়ণ দেশপাণ্ডে একই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। সেটি আমি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থে (১ম খণ্ডে) উপস্থিত করেছি। ১৮৯৭ সালের গোড়ার দিকে স্বামীজী ভারতে

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কৃত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (তিন খণ্ডে), 'সহাস্য বিবেকানন্দ', 'নিবেদিতা লোকমাতা', 'সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং', 'ভারতচন্দ্র', 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। 'বিবেকানন্দ ইন্ ইণ্ডিয়ান নিউজপেপার্স' গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক।

ফিরলে তাঁর সঙ্গে তিলকের অল্পবিস্তর পত্রবিনিময় হয় (যার সন্ধান কিন্তু পাওয়া যায়নি)। এর পর র‍্যাণ্ড অ্যাণ্ড আয়ার্স্ট-এর হত্যাকাণ্ড-সূত্রে তিলকের গ্রেপ্তার এবং অন্যায় শাস্তিতে স্বামীজী অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। স্বামীজীর সেই প্রতিক্রিয়ার কিছু কথা 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর প্রকাশিতব্য চতুর্থ খণ্ডে আছে। তিলকের পত্র-পত্রিকায় বিবেকানন্দ-বিষয়ক প্রচুর লেখার উল্লেখও সেখানে মিলবে। এখানে আমি পটভূমিকাসহ উভয়ের পরবর্তী এবং শেষ সাক্ষাতের বিবরণই তুলে ধরতে চাইছি।

১৯০১ খ্রী. ডিসেম্বর মাসের শেষে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন কলকাতায় হওয়ার অন্ততঃ একটি শুভফল আমরা দেখতে পাই—এর ফলেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নায়কের সঙ্গে ভারতের ধর্মগুরুর সাক্ষাৎ সম্ভব হয়েছিল। এই সাক্ষাতের পরে স্বামীজী আর মানবদেহে থাকবেন না।

কলকাতায় আসার পথে তিলক বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। তাই ছিল স্বাভাবিক। তিলকের চরম পন্থা, দুঃসাহস, ত্যাগবরণ—ভাবপ্রবণ বাঙালীর কল্পনাকে চঞ্চল করেছিল। তিলকের মামলার সময়ে বাংলাদেশ থেকে তাঁকে আর্থিক ও আইনগত সাহায্য করা হয়। তখন মহারাষ্ট্র ও বাংলার মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির মতে, ভারতের রাজনৈতিক অশান্তি বাঙালী বাবু ও মরাঠি ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি।

পুনার বাইরে তিলক যে কলকাতাতেই সর্বাধিক সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, তা 'মরাঠা' পত্রিকার ১২ জানুয়ারী, ১৯০২, সম্পাদকীয়তে স্বীকৃত হয়েছিল :

'কারামুক্ত হবার পরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে যোগ দিতে মিঃ তিলক কলকাতায় প্রথম গিয়েছিলেন—সেই কারণে কংগ্রেসে সমবেত বাঙালীরা যোগ্যভাবে তাঁর বিষয়ে আবেগ প্রকাশ করবেন, সেটাই প্রত্যাশিত। মিঃ তিলক যখন তৃতীয় দিনের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব সমর্থনের জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন যে অভিনন্দন লাভ করেন, তা সত্যই অপূর্ব—সমগ্র জনমণ্ডলী দাঁড়িয়ে উঠে প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনির সঙ্গে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। কংগ্রেস-সপ্তাহের মধ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত যে-দু'একটি সামাজিক সভায় তিলক যোগদান করেছিলেন, সেই সকল জায়গাতেও অনুরূপ অভিনন্দন তাঁকে জানানো হয়। এই কলকাতাই তিলকের আত্মসমর্থনের জন্য দশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিল, এবং কলকাতার কাছেই তিনি ১৮৯৭ সালের কেসরী মামলার আইনবিষয়ক পরামর্শাদির জন্য মুখ্যতঃ ঋণী। সুতরাং নিজ প্রদেশের বাইরে মিঃ তিলক কলকাতাতেই যে সবচেয়ে অনুরাগপুষ্ট সংবর্ধনা লাভ করবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।' [অনূদিত]।

কংগ্রেসের কোলাহল ত্যাগ ক'রে, কংগ্রেসের এই লোকমান্য নায়ক একদিন উপস্থিত হলেন কলকাতার কয়েক মাইল দূরে একটি সন্ন্যাসী-মঠে—এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-বাসনায়—যে সন্ন্যাসী দেশের আচার্য-বরিষ্ঠ।[১] এই সাক্ষাৎকার তখন সংবাদপত্রের

১ ভারতের জাতীয় চেতনাসৃষ্টিতে যাঁর দান সর্বাধিক, সেই বিবেকানন্দের দর্শনে

বিষয় হয়নি। অন্যান্য সংবাদপত্রের কথা বাদ দিচ্ছি—তিলকের মরাঠা বা কেসরী, কিংবা বিবেকানন্দের উদ্বোধন বা প্রবুদ্ধ ভারত—কোথাও এই সাক্ষাতের উল্লেখ পাইনি। সাক্ষাৎকারটি সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু কেন হয়নি তা আমরা জানি না, কিন্তু এটা জানি, জগতের অধিকাংশ গভীর ও বৃহৎ ব্যাপার সংবাদপত্রের চোখের অন্তরালেই ঘটে থাকে।[২]

২

বিবেকানন্দ ও তিলকের এই সর্বশেষ সাক্ষাতের বিষয়ে তথ্য আমরা কয়েকটি সূত্র থেকে পেয়েছি, সেগুলি এই :

(ক) বেদান্ত কেশরী পত্রিকার প্রতিনিধিকে কথিত তিলকের স্মৃতিকথা, (১৯৩৪, জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত) যা পরে 'রেমিনিসেনসেস্ অব স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থভুক্ত হয়।

(খ) প্রহ্লাদ নারায়ণ দেশপাণ্ডে কর্তৃক ১৯১৫ সালে তিলকের কাছ থেকে সংগৃহীত স্মৃতিকথা। এটি 'লোকমান্য তিলক যাঁচ্যা আঠবণী ওয়া আখ্যায়িকা, খণ্ড তিসরা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এর বিবরণ বেদান্ত কেশরীর প্রতিনিধিকে প্রদত্ত তিলকের স্মৃতিকথার প্রায় অনুরূপ।

(গ) বিনায়ক বিষ্ণু রানাডের বিবরণ। একই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ইনি স্বামীজীর সঙ্গে তিলকের সাক্ষাৎকালে বেলুড় মঠে উপস্থিত ছিলেন।

(ঘ) মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদত্ত বিবরণ। স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামীজীর মরাঠি শিষ্য স্বামী নিশ্চয়ানন্দের কাছ থেকে শুনে ইনি পরবর্তী

উপস্থিত হওয়া কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা কর্তব্য মনে করেছিলেন। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর চতুর্থ খণ্ডে (১৯৮৮), একটি সমকালীন রচনার অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে পাই :

'তাঁর দেহত্যাগের কয়েক মাস আগে বড়দিনের সময়ে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। সেই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা স্থান থেকে প্রতিনিধিগণ, সংস্কারকগণ, অধ্যাপকগণ এবং জীবনের নানা পর্যায়ের বিরাট ব্যক্তিরা কলকাতায় সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই, শহরে অবস্থানকালে প্রতি অপরাহ্ণে বেলুড় মঠে আসতেন স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। স্বামীজী তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহের আলোচনায় আলোকিত করতেন। বস্তুতঃপক্ষে এই আলোচনাসভাগুলি যেন স্বতন্ত্র একটা কংগ্রেস হয়ে দাঁড়াত ; এই কংগ্রেস আসল কংগ্রেসের অধিবেশনের চেয়ে ভাবে ও চরিত্রে অনেক উচ্চধরনের হয়ে উঠত। তা ছিল অনেক বেশি কল্যাণকর।'

লখনৌ অ্যাডভোকেটের সম্পাদক এইখানে স্বামীজীর দর্শনে এসে তাঁকে 'উত্তর ভারতীয়ের পক্ষেও গৌরবজনক বিশুদ্ধ মার্জিত হিন্দীতে' কথা বলতে শুনেছিলেন, এবং দেখেছিলেন—'ভারতের জাগরণের জন্য তাঁর পরিকল্পনার কথা বলবার সময়ে তাঁর মুখ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।' [ইংরেজী জীবনী, চতুর্থ খণ্ড, ৩৬]।

২ বিবেকানন্দ-তিলক সাক্ষাৎ 'ভদ্রতা-বিনিময়'জাতীয়, সুতরাং সংবাদপত্রের বিষয় নয়, এবং তৎকালীন সাংবাদিকতা বৃহৎ ব্যক্তির সামাজিক জীবনের পশ্চাদ্ধাবন সাধারণতঃ করত না—এই জন্যই কি এই সাক্ষাতের বিবরণ পাই না সংবাদপত্রে? কিংবা সাক্ষাৎটি সত্যই গোপন ব্যাপার ছিল, যার কথা বাইরে প্রকাশিত হোক, তা বিবেকানন্দ বা তিলক চাইতেন না?

কালে সেই কথাগুলি লিখেছেন।

(ঙ) ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণ। তিলকের সহযোগী বিপ্লবী বসুকাকা যোশীর কিছু উক্তি ইনি উপস্থিত করেছেন।

(চ) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর বর্ণনা 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে।

(ছ) কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথা।

(জ) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণ লিখিত' স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনীর চতুর্থ খণ্ডে (১৯১৮ সালে প্রকাশিত, তিলক তখনো জীবিত) তিলকের নামোল্লেখ না ক'রে এই সাক্ষাৎকারের কথা জানানো হয়েছে।

৩

প্রথমে স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর বিবরণটুকু উপস্থিত করা যায়:

'এই বৎসর (১৯০১) ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ দলে-দলে বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা স্বামীজীকে আধুনিক ভারতের দেশ-প্রেমিক-ঋষি বলে মনে করতেন—তাঁকে দর্শন এবং শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে স্বামীজী প্রায়শঃ ইংরেজীতে কথা না বলে হিন্দীতে বলতেন, যা তাঁদের মনে নিশ্চিতভাবে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। একদিন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ এক নেতার সঙ্গে নিজের সর্বাধিক প্রিয় এক বিষয়ে কথোপকথনকালে স্বামীজী মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দেড় ঘণ্টাকাল এপাশ-ওপাশ পায়চারি করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে গভীর ভাবাবেগপূর্ণ অনর্গল বাক্য উৎসারিত হয়েছিল।'

কোনোই সন্দেহ নেই কংগ্রেসের ঐ অন্যতম সর্বোচ্চ নেতার নাম বালগঙ্গাধর তিলক।

উক্ত শেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদান্ত কেশরীতে সংকলিত তিলকের আত্মকথা এই:

"কলকাতায় এক কংগ্রেস-অধিবেশন-কালে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় মঠে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের অতি সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। আমরা এক সঙ্গে চা-পান করেছিলাম। কথাবার্তার সময়ে স্বামীজী কিছু রহস্য ক'রে বলেছিলেন, খুব ভাল হয় যদি আমি সংসার ত্যাগ ক'রে তাঁর বাংলাদেশের কাজের ভার গ্রহণ করি—সেক্ষেত্রে তিনি মহারাষ্ট্রে গিয়ে আমার কাজের ভার নেবেন। 'দূর দেশে যেমন প্রভাব বিস্তার করা যায়, নিজের দেশে তেমনটি হয় না'—তিনি বলেছিলেন।' "

এই সম্পর্কে প্রহ্লাদ নারায়ণ দেশপাণ্ডের সংকলিত তিলক-স্মৃতিতে যা পাই, তাতে বক্তব্যের ঐক্য থাকলেও ভঙ্গির পার্থক্য থাকায় নূতন ভাবারোপ হয়েছে। তাঁর রচনা তাই উদ্ধৃত করছি:

"যখন আমি (তিলক) ১৯০১ সালে কংগ্রেসে যোগ দিতে কলকাতায় যাই, তখন বিবেকানন্দের বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। সেখানকার স্বামীজীরা সকলেই আমাদের প্রাণখোলা অভ্যর্থনা জানান। শহরের উপান্তে গাছে-ঘেরা মঠ দেখে আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল। আমরা বিবেকানন্দের সঙ্গে কয়েক বিষয়ে আলোচনা করি। 'ধর্ম' তাঁর মুখ্য আলোচনার বিষয় হলেও জনগণ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তিনি সম্যক্ অবহিত ও উৎসুক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে-কোনো বিষয়ে

আলোচনাই গভীর আনন্দের বস্তু। আলোচনার সময়ে বুঝতে পারলুম—জনগণের শিক্ষা, ঐক্য, এবং জাগরণের বিষয়ে তাঁর কী তীব্র আগ্রহ! বিবেকানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'নিজ প্রদেশে মানুষের বুদ্ধির সক্রিয় প্রভাব সত্বর বিস্তৃত হয় না। আপনি ধর্মে বিশ্বাসী—সন্ন্যাস নিয়ে চলে আসুন বাংলাদেশে; এখানকার মানুষকে শিক্ষা ও ধর্ম দিয়ে জাগ্রত ক'রে তুলুন; আর আমি একই উদ্দেশ্যে যাই মহারাষ্ট্রে।' আমি তখনি বললাম, 'আমি কখনই সন্ন্যাস নেব না। বিবাহিত জীবনেই আমি সব কিছু করতে পারি। তাছাড়া আমি এও মনে করি না যে, নিজ প্রদেশে মানুষের বুদ্ধি সক্রিয় শক্তি দেখাতে পারে না। আমার মতে, যিনি নিজ প্রদেশে সামনের সারিতে থাকেন, অপর প্রদেশে কিংবা সমগ্র দেশে অগ্রবর্তী আসন লাভ করার সম্ভাবনা তাঁর আছে।' "

বেদান্ত কেশরীর বিবরণের সঙ্গে দেশপাণ্ডের বিবরণের পার্থক্য—প্রথম ক্ষেত্রে তিলক স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার বিষয় প্রায় জানান নি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা বলেছেন। দেখা যায়, ধর্ম ছাড়া যে-বিষয়টি আলোচনায় প্রাধান্য পায় তা হল, জনগণের সমস্যা। সাধারণ মানুষের জাগরণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর স্থায়ী উৎকণ্ঠার পরিচয় এখানে স্পষ্ট জানা গেল।

উভয় বিবরণেই আছে—স্বামীজী তিলককে সন্ন্যাস নিয়ে বাংলাদেশে এসে কাজ করতে বলেছিলেন। প্রথম বিবরণে দেখি, তিলক বলেছেন, স্বামীজী তাঁকে রহস্য ক'রে ঐ কথা বলেছিলেন। দেশপাণ্ডের বিবরণে স্বামীজীর রহস্য ক'রে কথা বলার উল্লেখ নেই। তাতে অর্থ-মাত্রার প্রভূত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

তিলককে স্বামীজী রহস্য ক'রেই সন্ন্যাস নিতে বলেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এও বলা চলে, তিনি রহস্য ক'রে প্রাণের কথাই বলেছিলেন। একই অনুরোধ তিনি জাপানী ওকাকুরাকেও করেন।

তিলক সন্ন্যাসী হতে চাননি। তিনি নিশ্চয় স্বামীজীর রহস্যোক্তিকে রহস্য ক'রেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে তিলক যে, সন্ন্যাস অপেক্ষা গৃহীর কর্মসন্ন্যাসে অধিক আস্থাশীল ছিলেন, তা বেদান্ত কেশরীর বিবরণেও পাই। সেখানে তিনি বলেছেন, ১৮৯২ (১৮৯৩) খ্রীষ্টাব্দে তিনি ও স্বামীজী একমত হয়েছিলেন যে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সংসারত্যাগের কথা প্রচার করেনি—তা ফলাকাঙ্ক্ষাহীনভাবে নির্লিপ্ত হয়ে কাজের কথা বলেছে। অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, স্বামীজীর মত সম্বন্ধে তিলকের উক্তি ঠিক নয়।

এবং এক্ষেত্রে আমরা যোগ করতে পারি, সন্ন্যাসের ব্যক্তিমুক্তির লক্ষ্যের কথা বাদ দিলেও, ভারতের জাগরণের জন্য অন্ততঃ ভারতীয় নেতা ও কর্মীদের কিছু সময়ের জন্য সন্ন্যাসীতুল্য জীবনযাপন করতে হবে—স্বামীজী তা স্পষ্ট বুঝেছিলেন। সে কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল পরে। পরবর্তী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী, এবং অরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসীতুল্য।[৩]

দেশপাণ্ডের বিবরণের শেষাংশ পুরো

---

৩ সন্ন্যাস সম্পর্কে তিলকের সঙ্গে শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসীদের মতভেদ ছিলই। মরাঠিতে

গ্রহণযোগ্য নয়। সেখানে দেখি—'নিজ প্রদেশে প্রতিভার সমাদর হয় না'—স্বামীজীর এই কথা শুনে তিলক যেন স্বামীজীকে রীতিমতো সংশিক্ষা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য স্বামীজী আর তখন 'শিক্ষিত' হবার অবস্থায় ছিলেন না। উল্টোদিকে, তিলক যথেষ্টই জানতেন, স্বামীজী কোন্ গভীর বেদনা থেকে ঐ রহস্যোক্তি করেছেন। এই সাক্ষাতের বহু পূর্বে স্বামীজীর প্রসঙ্গে তিলকের পত্রিকায় বেশ কয়েকবার ক্ষোভের সঙ্গে লেখা হয়—'No Prophet is honoured in his own country.' বিবেকানন্দ-বিরোধীদের চরিত্র তিলক যথেষ্টই জানতেন, সে-বিষয়ে তিনি তাঁর কাগজে উল্লেখও করেছেন। এক্ষেত্রে তিলকের পক্ষে সেই বিশাল বেদনাময় ব্যক্তিত্বকে উক্ত পরিপক্ক উপদেশ দেওয়ার চালাকি করা সম্ভব ছিল না। তিলক জানতেন, স্বামীজী আপস করার পাত্র নন, তিনি রাজনৈতিকও নন, তিনি উত্থানের বার্তা দিতে এসেছেন—তাঁর বিরোধিতা থাকবেই সমকালে। ঐ জাতীয় মেসেজ একেবারে সমকালে কার্যকর হয় না—তা কার্যকর হয় যখন ঐ মেসেজের মধ্যে লালিত মানুষ সমাজের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবস্থায় আসে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে স্বদেশী আন্দোলন ও পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই বাংলাদেশ ও বৃহত্তর ভারতবর্ষ স্বামীজীর বাণীকে সত্য বলে প্রমাণ করেছিল। উল্টোপক্ষে দেখি, এই সাক্ষাতের ৬ মাস পরে বিবেকানন্দের উপর শোকপ্রবন্ধ লিখে, তাঁর কোনো কোনো বক্তব্যের জন্য তিলক নিজ প্রদেশে বিবেকানন্দ-বিরোধীদের কাছ থেকে

লেখা তিলকের সুবিখ্যাত সুবৃহৎ গীতারহস্যের ক্ষুদ্র এক সারসংক্ষেপ ইংরেজীতে করেন জনৈক ভি এস যোশী। এই পুস্তিকার উপর প্রবুদ্ধ ভারত অগস্ট, ১৯১৬ আলোচনা করে। তিলকের মতামতকে যথাযথভাবে ঐ পুস্তিকায় উপস্থিত করা হয়েছে কিনা সে-বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারত ঈষৎ সংশয় প্রকাশ করে। তিলক অদ্বৈতবাদী ছিলেন, যে-ব্যাপারটি উক্ত যোশীর পছন্দের নয়, তাও বলা হয়।

তথাপি যোশী-উপস্থাপিত তিলকের মতের একটি অংশের প্রতিবাদ প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক করেছিলেন। তিলকের অভিযোগ ছিল, শঙ্করাচার্য নিজ মতের সমর্থনে গীতার মূল পাঠের অনুচিত ব্যাখ্যা করেছেন। সেকথার সত্যতা কিছুটা স্বীকার ক'রে সম্পাদক বলেন, ও-রকম ব্যাপার শঙ্করাচার্য অতি অল্প ক্ষেত্রেই করেছেন। তাছাড়া কাল-প্রয়োজনও ছিল। বৈদিক অদ্বৈতবাদের উপর যখন সর্বদিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছিল—মন ও বুদ্ধির বিশৃঙ্খলার সেই যুগে মূল ধর্মাধার কারা হবেন সেই প্রশ্নের মীমাংসারূপে শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসাশ্রমের উপরে জোর দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস এবং কর্মযোগের মধ্যে তিলক যে ভেদরেখা টানতে চেয়েছিলেন, প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক তাতেও আপত্তি করেছিলেন। তাঁর মতে, শঙ্করাচার্য কর্মবিরতি চেয়েছিলেন, একথা সত্য নয়। ভারতের ইতিহাসের প্রধান এক কর্মবীর শঙ্করাচার্য—তিনি কর্মবিরতি দিলেন? কোন্ আধুনিক দেশপ্রেমিকের জীবন তাঁর থেকে কর্মময়?— সম্পাদকের প্রশ্ন। অবতারদের নিরন্তর কর্মময় জীবনের কথা বাদ দিয়ে, সন্ন্যাসীদের জীবন পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, তাঁদের মধ্যে চার প্রকার যোগেরই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে—সম্পাদক দাবি করেছিলেন।

কিন্তু সত্যই কি তিলক শঙ্করাচার্যকে কর্মত্যাগের আদর্শ প্রচারকরূপে ভেবেছিলেন? এই প্রবন্ধের শেষাংশে আমরা স্বামীজীর দেহান্তের পরে তাঁর বিষয়ে তিলকের লেখা প্রবন্ধে তো শঙ্করাচার্যকে প্রচণ্ড কর্মবীর রূপেই দেখি!!

অত্যন্ত গঞ্জনা লাভ করেছিলেন। সেকথা অন্যত্র বলেছি। ['বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৭-২০]

বেদান্ত কেশরীর বিবরণে স্বামীজীর সঙ্গে তিলকের রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার কথা নেই—তা কিছু আছে দেশপাণ্ডে-বিবরণে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় এবিষয়ে অল্প সংবাদ পাই :

'এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার [ডঃ দত্তের] মনে পড়ছে। ১৯২৫ খ্রীঃ গৌহাটিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে পুনার চিত্রশালা প্রেসের বসুকাকা আমাকে বলেছিলেন, স্বামীজী যখন বালগঙ্গাধর তিলকের গৃহে অতিথিরূপে বাস করেছিলেন (তিনি তখন অন্য নামে পরিচিত ছিলেন), তখন তাঁদের মধ্যে আলোচনাকালে বসুকাকা উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে তিলক বলে-ছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের জন্য তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করবেন, এবং স্বামীজী কাজ করবেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে।' ['স্বামী বিবেকানন্দ', পৃঃ ২০৩]।

বেশি কথার প্রয়োজন নেই, স্পষ্টই বোঝা যায়, ডঃ দত্তর স্মৃতি প্রতারণা করেছিল। বসুকাকা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিলকের বাড়িতে বিবেকানন্দ-তিলক আলোচনার কথা বলেন নি—বলেছিলেন ১৯০১ ডিসেম্বর বা ১৯০২ জানুয়ারীতে বেলুড়ে উভয়ের আলোচনার কথা। বসুকাকা ঐ সময়ে তিলকের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন, তা তিলকের জীবনীতেই [প্রধান ও ভগবত রচিত] পাই।

বিবেকানন্দ ও তিলকের রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সংবাদ দিয়েছেন তিলকের আর এক সহযাত্রী বিনায়ক বিষ্ণু রানাডে। ইনি নাগপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত ট্রেনে তিলকের সঙ্গে আসেন, বেলুড়েও তিলকের সঙ্গে যান। এঁর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। ইনি লিখেছেন :

"আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানাইয়া স্বামীজী আমাদের আশ্রমে লইয়া গেলেন। আমরা দুগ্ধ ও ফল গ্রহণ করিলাম। তারপর আকর্ষণীয় আলোচনা হইল। তাহার মূল্যবান অংশ মনে আছে। স্বামীজী প্রধানতঃ বলিলেন, 'আমরা পরপদানত। আমাদের রাজনৈতিক কার্যাবলীকে আত্মনির্ভর হইতে হইবে। আমাদের পদ্ধতি হইবে ধ্বংসাত্মক [প্রতিরোধাত্মক ?]। তাহা এমন হইবে যাহাতে আমাদের শাসকগণ হাঁটু গাড়িয়া নতি স্বীকারে বাধ্য হয়।' "

ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রায় শেষ কথা এখানে আমরা পেলাম। স্বামীজীর জীবনীতে বিনায়ক বিষ্ণু রানাডের এই তথ্যের গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত। এইকালে এই জাতীয় কথা স্বামীজী নানা জনকে বলেছেন। তখনি ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব কিনা, সে-বিষয়ে তাঁর মনে যদিও কিছু দ্বিধা ছিল, কিন্তু নির্ভয় সংগ্রাম যে চাই, সে-বিষয়ে কোনো দ্বিধাই ছিল না। আবেদন-নিবেদন নয়—সক্রিয় প্রতিরোধ—হিংসা বা অহিংসা, যে পথেই হোক। ঢাকায় তরুণদের এইকালেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে উৎসাহ দিয়েছেন, জাতিকে জাগাতে বোমার দরকার, এমন কথাও নাকি বলেছেন। এসব তথ্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ব্যক্তিগত আলাপেও একথা আমাদের বলেছেন। অন্য সূত্র থেকেও তা পাই। রানাডে-প্রদত্ত বিবরণ তাই স্ব-কপোলকল্পিত কিছু নয়।

তবে স্বামীজী এই ধরনের কথা উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন বলতেন না। বিনায়ক রানাডে যথার্থই লিখেছেন :

'স্বামীজী জানতেন, বলবন্ত রাও তিলকই একমাত্র মানুষ যিনি উপরে-কথিত ধারায় কার্যাবলী চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।'

৪

বিবেকানন্দ তিলকের শেষ সাক্ষাতের' প্রসঙ্গ এখনো শেষ হয়নি। এখানে একটি প্রশ্ন উঠবার কারণ ঘটেছে—এইকালে উভয়ের মধ্যে কবার সাক্ষাৎ ঘটেছিল? বেদান্ত কেশরীর ও দেশপাণ্ডের বিবরণ এবং বিনায়ক রানাডের স্মৃতিকথা—সকল ক্ষেত্রেই দেখি, মাত্র একবার সাক্ষাতের কথাই আছে; এবং আলোচনাকালে সকলে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে তিলকের সঙ্গে মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামীজীর পায়চারি করতে-করতে দেড় ঘণ্টা আলোচনার কথা আছে। একাধিক সাক্ষাতের উল্লেখ সেখানে নেই। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থে ভিন্ন সংবাদ পাই। মহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক পরিবেশিত অনেক অজ্ঞাত চমকপ্রদ সংবাদের সমর্থন আমরা সমকালীন তথ্যসূত্র থেকে পেয়েছি বলে, তাঁর কথা বিনা বিচারে উড়িয়ে দিতে পারি না। আগেই বলেছি, মহেন্দ্রনাথ তিলকের মঠে আগমনের বিষয়ে সংবাদ জেনেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দের [বিবেকানন্দের মরাঠি শিষ্য] কাছ থেকে। নিশ্চয়ানন্দের কথিত বিবরণ এই :

'এক বৎসর কলকাতায় কংগ্রেস হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তিলক কলকাতায় এসেছিলেন। স্বামীজীর শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁর সঙ্গে সাধারণ লোকের সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ ছিল। তিলক একদিন অপরাহ্ণে নৌকা করে এসে মঠের দক্ষিণ অংশে বেলতলার দিকে নৌকা লাগিয়ে উঠলেন, এবং নিজের নাম-লেখা একখানা কার্ড একটি বৃদ্ধ সাধুকে দিলেন, যাতে স্বামীজী শীঘ্র তাঁর আসবার খবর পান। বৃদ্ধ সাধুটির বিবেচনা-শক্তি কোনো বিশেষ কারণবশতঃ একটু ভিন্ন প্রকারের ছিল। তিলক মঠে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃদ্ধ সাধুটি মঠ-বাড়ির এদিক-ওদিক ঘুরে তিলককে বললেন—স্বামীজীর শরীর অসুস্থ, তিনি এখন সাক্ষাৎ করবেন না। তিলক অতি বিনীতভাবে বললেন, আচ্ছা, স্বামীজীকে সময়মতো কার্ডখানি দেবেন। এই বলে তিনি নৌকা করে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী নীচে নামলে বৃদ্ধ সাধুটি তাঁকে কার্ডখানি দিলেন। স্বামীজী কার্ডে তিলকের নাম দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিলক কোথায়? বৃদ্ধ সাধুটি বললেন, সে ব্যক্তি অপরাহ্ণে এসেছিলেন, এখন চলে গেছেন। স্বামীজী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং নানাপ্রকার ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। শেষে আমাকে বলতে লাগলেন, তুই তো মরাঠি, তুই তো তিলককে জানিস, তুই কেন আমাকে খবর দিসনি? তারপর স্বামীজী নিজের হাতে তখনি তিলককে একখানি পত্র দিলেন এবং বৃদ্ধ সাধুটিকে আদেশ দিলেন, তোমার শাস্তি-স্বরূপ এই চিঠি নিয়ে হাওড়া গিয়ে ডাকঘরে দিয়ে আসতে হবে। স্বামীজী মহা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আদেশ পালন করতেই হবে।...

'তিলক পত্র পেয়ে দু' একদিনের ভেতর মঠে এলেন। মঠ বাড়ির দক্ষিণ দিকের মাঠে পায়চারি করতে-করতে স্বামীজীর সঙ্গে নানাপ্রকার কথা কইতে লাগলেন। সেখানে

কারও যাওয়ার আদেশ ছিল না। দূর থেকে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝা গেল যে, স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে মাথা ও হাত নেড়ে কথা কইছেন, আর তিলক ধীর ও শান্তভাবে সেইসব কথা শুনছেন। কিন্তু কী কথাবার্তা হয়েছিল তা আমরা কেউই বিশেষ কিছু জানি না।

'তিলক আগে শুধু মরাঠা দেশের ব্রাহ্মণদের জন্য নানা চেষ্টা করেছিলেন। স্বামীজী বুঝিয়ে দিলেন যে, একটা জাতিকে তুলতে হলে জাতের মাত্র একটা অংশ তুললে চলবে না। গরীব, দুঃখী, নিম্নশ্রেণীর সকলকেও না তুললে জাত উঠবে না। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসা অবধি তিলকের মনোভাবের পরিবর্তন হল। তিনি নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্যও নানাপ্রকার প্রচেষ্টা করতে লাগলেন। [স্বামীজীর সংস্পর্শে আসা অবধি লোকমান্য তিলকের মনোভাবের যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল, এই কথা নিশ্চয়ানন্দ বারংবার বলিতে লাগিলেন।] যাহা হউক তিলক মাঝে-মাঝে মঠে আসতেন ও স্বামীজীর সহিত তাঁর নানা বিষয়ের আলোচনা হত।

'লোকমান্য তিলক মঠে এসে ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি করতেন।...একদিন অপরাহ্ণে তিলক এসে মোগলাই চা তৈয়ার করলেন। জায়ফল, জায়ত্রী, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, জাফরান ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য দিয়ে একটা সিদ্ধজলের কাথ তৈয়ার করলেন এবং সেই সিদ্ধজলের কাথে চা, দুধ ও চিনি দিয়ে মোগলাই চা করলেন। এক হাণ্ডা চা হয়েছিল। তিলক বললেন, "এক বাটি করে চা খাবেন, বেশি খাবেন না।" চা পান করতে সুস্বাদু হয়েছিল। এজন্য অনেকেই দু' তিন বাটি খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ করে বললেন, "হাণ্ডা-সুদ্ধ চা তো রইল, পরে দরকার হয় তো খাবেন।" চা এত উগ্র হয়েছিল যে, যত সময় যেতে লাগল ততই শরীরের ভিতর উষ্ণতা প্রবল হতে লাগল, দ্বিতীয়বার চা পান করতে কারো ইচ্ছা রইল না। [লোকমান্য তিলকের কথা বলিতে-বলিতে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন।]' ['নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান' পৃঃ ১২-১৪, মহেন্দ্রনাথ দত্ত]।

প্রত্যক্ষদর্শীর একটা সজীব বিবরণ পেলাম। এতে পূর্বে উদ্ধৃত বিবরণগুলির সঙ্গে প্রধান পার্থক্য—তিলকের একাধিকবার মঠে আগমন-সংবাদ এতে আছে। নূতনতর নির্ভরযোগ্য তথ্য না পেলে বিষয়টির সুনিশ্চিত মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে ব্যাখ্যারূপে বলা যেতে পারে—তিলকের সঙ্গীরা তিলকের একাধিকবার মঠে আসার কথা না জানতে পারেন, কারণ তিলক যদি বিশেষ প্রয়োজনে মঠে গিয়ে থাকেন গোপনেই যাবেন। আর পরবর্তী কালে তিনি সেই গোপন সাক্ষাতের কথা বলার প্রয়োজন মনে করেননি। অপরপক্ষে মরাঠি সন্ন্যাসী নিশ্চয়ানন্দের কাছে মরাঠি-শ্রেষ্ঠ তিলকের আগমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল, তাই তিনি সেই সময়কার ঘটনা বিস্মৃত হননি, এবং মঠে তিলকের ঘরোয়া আচরণের খুঁটিনাটি-গুলি মনে রেখেছিলেন। তিনি যে-রকম বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে সেগুলি ভিত্তিহীন না হওয়াই সম্ভব।

৫

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর লেখায় উক্ত সাক্ষাৎকারের আর একটি চিত্র :

'এবার ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস। কংগ্রেস হইতে কতিপয় সদস্য, বিশেষতঃ মিঃ তিলক, ধূলিপায়ে বেলুড় মঠে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতে আসিলেন। ঠাকুরঘর হইতে পূজা শেষ করিয়া স্বামীজী অবতরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তিলক-মহারাজকে পুরোভাগে রাখিয়া সদস্যেরা জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। স্বামীজী দেশাত্মবোধের বাণী বজ্রগম্ভীর স্বরে নিনাদিত করিলেন।'

এই বর্ণনার উৎস কী, গিরিজাশঙ্কর জানাননি। তিনি কি কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনে লিখেছেন?

এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর আর একটি ক্ষুদ্র বর্ণনা কিন্তু আমরা পেয়েছি। কুমুদবন্ধু সেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখে পাঠিয়েছিলেন:

'বেলুড় মঠে তিলক স্বামীজীর সম্মুখে যুক্ত-করে দাঁড়িয়েছেন এবং দামোদর হরি চাপেকরের কথা বলিতেছিলেন। সেদিন আমি মঠে উপস্থিত ছিলাম এবং ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' [৪]

কুমুদবন্ধু সেন ২২.১.৫৭ তারিখে স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবনে স্বামীজীর জন্মোৎসব-সভায় বিবেকানন্দ-তিলক সাক্ষাৎকারের বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেন বলে, ডঃ দত্ত জানিয়েছেন। 'স্বামীজী [আলোচনাকালে] লোকমান্য তিলককে জিজ্ঞাসা করেন, কেন চাপেকরদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা হচ্ছে না?' [৫]

বিবেকানন্দ-তিলকের এই শেষ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে সব শেষে উদ্ধৃত করতে পারি বিনায়ক রানাডের সংযত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনাটিকে:

'বলবন্ত রাও তিলক এবং আমরা দশ-বার জন দক্ষিণী গঙ্গা পার হইয়া মঠভূমিতে অবতরণ করিলাম। বলবন্ত রাওকে স্বামীজী অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া হাত ধরিয়া নৌকা হইতে নামাইলেন। তারপর তাঁহাকে স্বামীজী বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আমরা ভাবিলাম, ইহা বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মিলন।'

প্রায় আশি বছর পরে আজ আমরা জেনেছি—ঐ মিলন শুধু বাংলা ও মহারাষ্ট্রের নয়—ভারতের আত্মশক্তি ও প্রাজ্ঞ কর্মশক্তির মিলনও বটে।

---

৪ 'স্বামী বিবেকানন্দ', পৃঃ ২০৪, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

৫ কুমুদবন্ধু সেন তিলকের বিবেকানন্দ-অনুরাগের আরও সংবাদ দিয়েছেন। বেদান্ত কেশরী পত্রিকার অগস্ট ১৯৪৮ সংখ্যায় 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ' প্রবন্ধে—১৯০৫ সালে বোম্বাই শহরে প্রথম প্রকাশ্য রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের বিবরণ তিনি দেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য কালীপদ ঘোষ এবং লেখক কুমুদবন্ধু সেন। তিলকের আইন-জীবী বন্ধু, মিঃ সেটলুর (বিবেকানন্দের পরিচিত এবং উৎসাহী অনুরাগী) এই উৎসবে বিশেষ সহযোগিতা করেন। স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ কাওয়াসজী জাহাজীর হলে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেছিলেন।

এই সভায় যোগদানের জন্য তিলককে অনুরোধ জানিয়ে কুমুদবন্ধু পত্র লেখেন। ঔরঙ্গাবাদ থেকে তিলক উত্তরে বলেন (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫), তিনি অন্য কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় সভায় যোগদান করতে সমর্থ নন। তিনি পত্র শেষ করেন এই বলে, **'Both the Master and the Pupil are held in high esteem by me, and I wish every success to your movement, which has my full sympathy.'**

এর অল্পদিন পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে বোম্বাইয়ে বক্তৃতা

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তিলক কোন্ ধারণাসহ পুনায় ফিরে গিয়েছিলেন—তা প্রকাশিত হল কয়েক মাস পরেই। স্বামীজীর দেহান্তে কেসরী পত্রিকায় স্বামীজীর চিত্রসহ একটি দীর্ঘ শোকপ্রবন্ধ লিখলেন তিলক। প্রবন্ধের তলায় লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু এটি তিলকেরই রচনা; এটি তাঁর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং প্রামাণ্য জীবনীকারেরা এটিকে তিলকের লেখা বলেই জানিয়েছেন। প্রবন্ধমধ্যে তিলক স্বামীজীর জীবন ও কর্মকাণ্ডের মুক্ত বন্দনা করেছিলেন। এই বন্দনা করবার সময়ে তিলকের মতো স্থিতধী পুরুষ নিশ্চয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেছিলেন, কারণ এর মধ্যে তিনি বিবেকানন্দকে নব শঙ্করাচার্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন, যা করার দায়িত্ব ছিল সুগম্ভীর, বিশেষতঃ স্ব-প্রদেশের রক্ষণশীল সমাজের কাছে। বিবেকানন্দ-বিরোধীদের চেহারা তিলকের যথেষ্টই জানা ছিল। এই লেখার জন্য সমাজ-সংস্কারকদের পক্ষ থেকে তিলককে কটু সমালোচনা করা হয়, [সমাজ-সংস্কারকদের শঙ্করাচার্য-প্রীতি, বিচিত্র ব্যাপার বটে!]—একথা আগেই বলেছি। তবু তিলক লিখেছিলেন, কারণ যাঁকে ভারতের নব শঙ্করাচার্য বলে মনে করেছেন, তাঁর লোকান্তরে শ্রেষ্ঠ নমস্কার জানানোর পবিত্র কর্তব্য পালন না করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সেই লেখাটি অনুবাদে উপস্থিত করছি। এর মধ্যে অল্পস্বল্প তথ্যভ্রান্তি আছে, যা ঐকালে অস্বাভাবিক নয়।

শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের চিরসমাধিতে প্রস্থান

সহস্র-সহস্র হিন্দু, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তের সংবাদে শোকার্ত না হইয়া পারিবেন না। স্বামী বিবেকানন্দ গত শুক্রবার কলিকাতার নিকটবর্তী বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর নাম জানে না এমন হিন্দু আছে কিনা সন্দেহ। উনবিংশ শতাব্দীতে জড় বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের নিকট সহস্র-সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে যে-অধ্যাত্মবিজ্ঞান বর্তমান আছে তাহার অপূর্ব স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সে-বিষয়ে শ্রদ্ধা জাগরিত করা, সেইসঙ্গে ঐ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উৎসভূমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি

করতে আসেন। 'বালগঙ্গাধর তিলক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রদত্ত চারটি বক্তৃতার একটিতে সভাপতির ভাষণে [কুমুদবন্ধু লিখেছেন] স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং বোম্বাইয়ের জনগণের উদ্দেশ্যে সেখানে একটি সন্ন্যাসী-পরিচালিত রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। এমন-কি তিনি কেসরীতে প্রধান সম্পাদকীয় রচনায় বলেন, কলিকাতা ও মাদ্রাজের মতো বোম্বাইতেও মিশনের একটি কেন্দ্র থাকা উচিত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উপস্থিতিতে একটি কমিটি গঠিত হয়, যার সভাপতি হন স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ; সেক্রেটারি—ডাঃ বৈদ্য; কয়েকজন বাঙালীসহ বোম্বাইয়ের বিখ্যাত কিছু নাগরিক কমিটির সদস্য। তিলককে সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি অস্বীকার করেন এই বলে—তিনি রাজনৈতিক কর্মী, তাঁর নাম থাকলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে। সদস্য না হয়ে, বাইরে থেকে তিনি অধিক সাহায্য করতে পারবেন।'

স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তের পর কেসরী পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের আংশিক চিত্র

স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তের পর কেসরী পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের আংশিক চিত্র

সৃষ্টি করা—অল্প শক্তির কাজ নহে। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের প্রবাহ এমনই দ্রুতগতিতে বিস্তারলাভ করিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাকে বিপরীত-মুখী করিতে হইলে অসাধারণ সাহস ও অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি এই কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম ইহার বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা নিছক যুক্তিনির্ভর। ইহা ছাত্রকে ধর্মচিন্তা হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। শুধু তাই নয়, অধিকন্তু তাহা নিজ ধর্মসহ সকল ধর্মের কুৎসা করিতে উৎসাহিত করে। যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দেরও একই প্রবণতা ছিল। স্বামীজী পূর্বাশ্রমে বঙ্গদেশীয়। তাঁহার বর্তমান বয়স ৩৫ বা ৪০। বৎসর কুড়ি পূর্বে তাঁহার শিক্ষাজীবন শেষ হয়। ইহার দ্বারাই বোঝা যায় সেইসময় তাঁহার মনোভাব কিরূপ ছিল, কারণ কলিকাতা বা পুনা বা বোম্বাই—সকল স্থানেই ইংরেজী শিক্ষার প্রকৃতি অভিন্ন। স্বামীজীর পূর্ব-নাম নরেন্দ্রনাথ সেন [দত্ত], তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। কথিত আছে, বাল্যে এক জ্যোতিষী তাঁহার কোষ্ঠী দেখিয়া তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন, এই বালক কোনোদিন বিবাহ করিবে না। ১৮ বা ১৯ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাস করেন। সেইসময় হইতে তাঁহার মনে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহের সূত্রপাত হয়। তাহার পূর্বে তিনি নাস্তিক ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মাচার্যের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি প্রশ্ন করিতেন—আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? এই প্রশ্নের দ্বারা তাঁহাদের বিব্রত করিয়া দিতেন। কিন্তু যখন হইতে তিনি শ্রী স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্রবে আসিলেন, তখন হইতে তাঁহার মনোজগতে পরিবর্তনের সূচনা হইল, এবং পরিশেষে তিনি তাঁহার শিষ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন সুপরিচিত—সে জীবনকথা ম্যাক্সমূলার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দেহাবসান হয়। তাঁহার শিষ্যগণ জনগণের মধ্যে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারের দ্বারা তাঁহার ভাব প্রচার করিতে শুরু করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের সহিত এই কাজে যোগদান করেন এবং আমেরিকা-বাসীদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সহিত পরিচিত করান। প্রথমে স্বামীজী ভারতের নানা স্থানে এবং হিমালয়ে কয়েক বৎসর পরিচয় গোপন করিয়া সিদ্ধ মহাপুরুষগণের সন্ধানে পরিভ্রমণ করেন। এই পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় আসেন। পুনা হইতে তিনি মহাবালেশ্বরে যান। সেখান হইতে যান বেলগাঁও, ধারওয়াড়, মাদ্রাজ ও রামেশ্বর। তাঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণের অভিপ্রায় মাদ্রাজেই জাগে; সেখানকার লোকের অর্থ-সাহায্যেই তিনি আমেরিকা যান। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো প্রদর্শনীর সময়ে সেখানে সর্বধর্মের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সেই ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠার সমুদয় গৌরব স্বামী বিবেকানন্দের। ধর্মমহাসভার পরে কয়েক বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া তিনি সেখানে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচার করেন। এই কাজ চালাইবার জন্য তিনি সেখানে মঠ প্রতিষ্ঠা ও শিষ্যগ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকা বর্তমানে সর্ব শাস্ত্র ও

মতের সম্মেলনভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এহেন দেশে অসাধারণ পুরুষ ভিন্ন অদ্বৈতের আলোচনা ও প্রতিষ্ঠা ঘটানো সম্ভব নহে, বিশেষতঃ যেখানে খ্রীষ্টান মিশনারিরা সদলে উপস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভারতের হিন্দুদের মধ্যে 'হিন্দুত্ব' বা হিন্দুধর্মই একমাত্র সংযোগসূত্র, এবং হিন্দুধর্মের মতসমূহ এমনই মহান যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও সেই মতগুলিকে কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও প্রচার করা সম্ভব। আজ হিন্দুর যদি কিছু থাকে এই ধর্মই আছে। যদি সে ধর্মত্যাগ করে তাহা হইলে সে নিজেকে জগতের কাছে ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র করিয়া তুলিবে। 'হিন্দুধর্ম কী, তাহা সঠিকভাবে জানো, তাহার নীতিগুলির অনুশীলন করো, শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে সেগুলি যাচাই করো, এবং সেইসকল ধর্মনীতিকে সমগ্র জগতে বিস্তার করিয়া নিজ নাম ও নিজ দেশের নামকে অক্ষয় করো।' এইসকল কথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভক্তি নিশ্চয় ধর্মের প্রধান লক্ষণ, কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত যুক্ত না হইলে ধর্ম পঙ্গু হইয়া যাইবে। ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিলেই তিনি এই কথাগুলির উপর জোর দিতেন। তিনি কখনো খ্রীষ্টানদের ধর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই। তিনি বলিতেন, 'তোমরা নিশ্চয় খ্রীষ্টের উপাসনা করিবে, কিন্তু যেহেতু দার্শনিক সিদ্ধান্তে তোমাদের ধর্ম দুর্বল তাই তোমরা তোমাদের ধর্মের মধ্যে আমাদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তকে গ্রহণ করো। তোমাদের আচার্যগণ অবশ্য অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকিয়াই তোমাদের ধর্মনীতি রচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ বা রাজযোগ—সত্যধর্মের বিভিন্ন পথস্বরূপ হওয়ার জন্য অন্য কোনো ধর্মের সহিত তাহার বিরোধ নাই, তাহা সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। যাহাদের নিকট বংশপরম্পরায় এই জ্ঞান রহিয়াছে তাহাদের অবশ্য-দায়িত্ব এই জ্ঞানকে প্রচার করা।' স্বামীজী সর্বসময়ে এই উপদেশই দিতেন। হিন্দুকে ধর্মবিষয়ে শিথিল-স্বভাব দেখিয়া তাঁহার বেদনার সীমা ছিল না। তিনি ইহাও অনুভব করিয়াছিলেন যে, ধর্ম-জাগরণ ভিন্ন জাতি-জাগরণ সম্ভব নহে, এবং তাহার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকায় শিষ্য তৈয়ারী করিয়া এবং অদ্বৈত প্রচার করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি প্রথমে সিংহলে যান, সেখান হইতে মাদ্রাজে। তারপরে কলিকাতায়। এবং তারপরে হিমালয়ের আলমোড়া-মঠে। সমস্ত যাত্রাকালে তাঁহার উপর অজস্রধারে প্রশস্তি বর্ষিত হইতে থাকে। ঐকালে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে তিনি উৎসাহ ও উদ্দীপনা ঢালিয়া দিয়াছেন। হুগলী নদীর ধারে বেলুড়ে তিনি আমেরিকানদের অর্থসাহায্যে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধর্মনীতি প্রচার করিতে পারে এমন শিষ্যধারা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। মঠভূমিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সমাধিমন্দিরও নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার সহকারিগণ আলমোড়া হইতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিতেছেন। ১৮৯৬-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষকালে পঞ্জাব রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মিগণ রাজপুতনায় গিয়া দুঃস্থরা যাহাতে মিশনারিদের কবলে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করেন। শ্রীবিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল—ভারতের সর্বত্র প্রচারক প্রেরণ করেন। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী না পাওয়ায় তাঁহার অভিপ্রায় অপূর্ণ থাকে। কিন্তু তিনি কলিকাতা, আলমোড়া, আজমীর, মাদ্রাজ ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে প্রচারক

নিয়োগে সমর্থ হইয়াছেন। আমেরিকাতেও তাঁহার দু'একজন শিষ্য স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে এক প্রদর্শনী হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সেইকালে ফরাসি ভাষা শিক্ষা করিয়া সেখানে সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে ফরাসি ভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এইজন্য তিনি সেখানকার সংবাদপত্রসমূহে বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। বৎসরাধিককাল তিনি হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। জাপানীরা তাঁহাকে তাহাদের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল। কিন্তু উক্ত অসুস্থতার জন্য তিনি যাইতে পারেন নাই। গত শুক্রবার তিনি যথারীতি ভ্রমণ করিয়া ফেরেন। তারপর তিনি অস্বস্তিবোধ করিতে থাকেন। একজন শিষ্যকে ডাকিয়া দেহত্যাগ করিব, এইরূপ বলেন। তারপর তিনবার গভীর শ্বাস লইয়া তিনি ঊর্ধ্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা যে তার পাইয়াছি, তাহা হইতে এই কথা জানিয়াছি। স্বামীজী যে এইভাবে যৌবনেই দেহত্যাগ করিবেন—ইহা দেশের পক্ষে অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পূর্ণভাবে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' ছিলেন, যেমন ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অক্কালকোট মহারাজ। স্বামী বিবেকানন্দই নানা বহির্দেশে হিন্দুধর্মের মহিমা স্থাপনের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, উৎসাহ এবং আত্মিক শক্তির দ্বারা উক্ত কার্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জনগণ আশাভরে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, এই ভিত্তির উপরে গঠিত সৌধের চূড়া স্বামীজী স্বয়ং তাঁহার শ্রীহস্তে নির্মাণ করিয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার অকাল দেহত্যাগে সে আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে। **দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে শঙ্করাচার্যই একমাত্র মহাপ্রাণ ব্যক্তি যিনি কেবল আমাদের ধর্মের গুরুভার কথা বলিয়া যান নাই, যিনি কেবল মুখে বলেন নাই যে, এই ধর্ম আমাদের শক্তি ও সম্পদ, এই ধর্মকে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য—তিনি তাহাকে কার্যে পরিণতও করিয়াছিলেন। সেই একই জাতীয় মানুষ স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত।** কিন্তু তাঁহার কার্য এখনো অসম্পূর্ণ। সেই কার্য সমাপন করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যগণ বা অন্য সকলকে আমরা আহ্বান করিতেছি। যদি আমাদের কোনো সম্পদ থাকে তাহা এই ধর্ম। আমাদের গৌরব গিয়াছে, স্বাধীনতা গিয়াছে, আর সব কিছুই গিয়াছে, শুধু আছে ধর্ম, যাহা অসাধারণ বস্তু। পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির সহিত সংঘাতের বিরুদ্ধে ইহা দাঁড়াইতে পারিয়াছে—ইহার শুদ্ধতা প্রমাণিত হইয়াছে। যদি এই ধর্মকে ত্যাগ করি তাহা হইলে আমরা ঈশপের গল্পের রত্নত্যাগী মোরগের মতো উপহাসের পাত্র হইব। এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন খোলা বাজারে প্রতিযোগিতা করিয়া আমাদের সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। সৌভাগ্যের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ সেই কাজ করিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি আরও কয়েক বৎসর বাঁচিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে এমন কিছু শক্তি পাইতাম যাহা আমাদের একজাতি-রূপে সংগঠিত করিয়া দিত। সন্দেহ নাই যে, তিনি তাঁহার কর্ম অনুযায়ী মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের উপর ন্যস্ত দায় উদ্ধার করিয়া

তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের মধ্যে স্বামীজীর ভাবধারা অব্যাহত রাখেন, যাহাতে আমরা, প্রাচীন ঋষিগণের আধুনিক বংশধরগণ, অদ্বৈততত্ত্বের সকল বস্তুকে জীবনে বরণ করিবার গৌরব অর্জন করিতে পারি। স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে আমরা তাঁহাকে দুই-তিনবার পুনা আসার অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। একবার তিনি পীড়িত ছিলেন, অন্যবার অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। এইসকল কারণের জন্য পুনাবাসী দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার ভাষণ শুনিতে পায় নাই।

৭

স্বামীজীর বিষয়ে তিলকের লেখা পেয়েছি, কিন্তু তিলকের বিষয়ে স্বামীজীর কোনো লেখা কার্যতঃ পাইনি। স্বামীজীর চিঠিতে তিলকের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র আছে। ই টি স্টার্ডিকে ৮ অগস্ট, ১৮৯৬, লেখা চিঠিতে স্বামীজী বলেছেন, 'নামটি হল বালগঙ্গাধর তিলক, এবং বইটির নাম ওরিয়ন।' মনে হয়, স্বামীজী তিলকের ঐ বইটির সঙ্গে পরিচিত হতে স্টার্ডিকে অনুরোধ করেছিলেন। ভারত-তাত্ত্বিক-রূপে তিলকের উল্লেখ একবার স্বামীজী করেছেন তাঁর পরিব্রাজক গ্রন্থে, "পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দুদের 'বেদ' অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ পাঁচ হাজার বৎসর আগে বর্তমান আকারে ছিল।" [স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬।১১৩]। তিলককে লেখা স্বামীজীর চিঠিগুলি পাওয়া গেলে বোঝা যেত, স্বামীজী তিলককে লিখিতভাবে কোন্ সমুচ্চ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিলক স্বামীজীর চিঠি নষ্ট করে ফেলেছিলেন, পাছে ঐ সূত্রে স্বামীজীর উপর পুলিশী উৎপাত হয়।

রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে তিলকের সম্বন্ধে স্বামীজীর বিপুল প্রীতি ও শ্রদ্ধার কথা সবিশেষ জানা ছিল। স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ) আমাকে বলেছেন, তিলকের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পরে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বলেছিলেন—আজ সত্য-কারের একজন 'মানুষ' দেখলাম। একথা স্বামী অভয়ানন্দ পুরাতন সাধুদের কাছ থেকেই শুনেছেন।

বেদান্ত কেশরীর অগস্ট, ১৯৫৬ সংখ্যায় তিলকের উপরে দীর্ঘ-এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে স্বামী তুরীয়ানন্দের তিলক সম্পর্কিত উক্তি উদ্ধৃত ছিল। ১৯০৫ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দ এক পত্রে লিখেছিলেন: শ্রীযুক্ত তিলক সম্বন্ধে আমার সমুচ্চ ধারণা এবং বিরাট শ্রদ্ধার কথা তুমি জানো। স্বামীজীর কাছ থেকে তাঁর চরিত্রের কত না প্রশংসার কথা আমি শুনেছি। তুরীয়ানন্দ আরও বলে-ছিলেন, অপরিচিত সন্ন্যাসীরূপে স্বামীজী যখন ভারতভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি তরুণ তিলককে তাঁর সমালোচক বন্ধুদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্য এবং সন্ন্যাসধর্মকে সমর্থন করতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ-তিলকের শেষ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তুরীয়ানন্দ বলেন, উভয়ের কথাবার্তার বিষয়বস্তু যদিও লিখিত হয়নি, কারণ সেই আলোচনাকালে কাউকেই সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি, এটা পরিষ্কার যে, তাঁরা ভারতের বহুবিধ সমস্যার বিষয়েই আলোচনা করেছিলেন—এবং সেগুলির সমাধানের জন্য কোন্ পরিকল্পনা নেওয়া যায়, সে বিষয়েও।

রামকৃষ্ণ সংঘের মধ্যে তিলকের বিষয়ে স্বামীজীর দেহান্তের পরেও একই প্রকার শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ধারা অব্যাহত ছিল—তিলকের মৃত্যুর পরে লিখিত প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকীয় মন্তব্যে [অগস্ট, ১৯২০] তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। তার অংশ উপস্থিত করেই প্রবন্ধ শেষ করব।

তিলককে ঐ সম্পাদকীয়তে 'মহারাষ্ট্রের প্রাণ' এবং 'ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যু 'জাতীয় বিপর্যয়'। তিলকের বিরাট পাণ্ডিত্য, অসাধারণ চরিত্র, এবং ত্যাগের উল্লেখ করার পরে বলা হয়—তিনি এদেশের মানুষের কাছে আশা-বিশ্বাস ও অনুপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উত্স। সম্পাদকীয় শেষ হয় এই কথা দিয়ে :

'বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানে, সুদৃঢ় স্বাধীনতা-চেতনায়, অসাধারণ মনস্বিতায় তিলক তাঁর পার্শ্ববর্তী মানুষদের তুলনায় বহু উর্ধ্বে বিরাজিত। সব জড়িয়ে একথা বলা যাবে, তিলক নিঃসন্দেহে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সর্বাধিক সম্মানিত সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর লোকান্তরে পৃথিবী হারিয়েছে এক-জন বিরাট পণ্ডিত এবং বিরাট মানুষকে, আর আমাদের দেশ হারিয়েছে এক যথার্থ দেশ-প্রেমিককে। সত্যই তিনি আধুনিক ভারত-গগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের অন্যতম।'

আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এ-লেখা স্বামীজীরও হতে পারত।

দাশরথি রায়ের ভক্তিগীতি

ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী*

দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) পাঁচালীর আখড়া স্থাপন করেন ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ বছর। রাজা রাম-মোহন রায় তিন বৎসর পূর্বে লোকান্তরিত হয়েছেন, তখনো বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেন কালীপ্রসন্ন সিংহ অজাত, বিহারী-লালের বয়স এক, সঞ্জীবচন্দ্রের দুই, মধুসূদনের বার, বিদ্যাসাগর অক্ষয়চন্দ্রের ষোল, দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের উনিশ, প্যারীচাঁদ ঈশ্বর গুপ্তের বাইশ, রাজা রাধাকান্ত দেবের বাহান্ন। গুপ্ত কবির সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল (২৮ জানুয়ারী, ১৮৩১) পাঁচ বছর আগে, দ্বিতীয় পর্যায়ে বারত্রাহিক রূপে (১০ অগস্ট, ১৮৩৬) এই বৎসর এবং দৈনিকরূপে তিন বৎসর পরে (১৪ জুন, ১৮৩৯)।

দাশরথির জীবৎকাল ৫১ বৎসর ৯ মাসের মধ্যে পাঁচালীকারের জীবন মাত্র বাইশ বৎসর কাল। তার প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব থেকে নানা দায়িত্বে কবিগানের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। কবির দলের সংস্রব ছেড়ে এসে পাঁচালীর পালা রচনা ও গাহনা-

* এম. এ., পিএচ্. ডি। প্রাক্তন 'বিদ্যাসাগর' অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
'দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী', 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী' এবং 'বৈষ্ণবপদ-নৈবেদ্য' ইঁহার [illegible] প্রকাশিত গ্রন্থ।

রীতিতে যে অভিনবত্ব সংযোজনা করলেন, পাঁচালীর সংস্কার করলেন—তাতে নূতন পদ্ধতির পাঁচালী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করল। তাঁর সমবর্তী ও পরবর্তী পাঁচালীকারগণ দাশরথির প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। জনসাহিত্যের পাঁচালী শাখায়—তৎকালের তো বটেই—সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি দাশু রায় স্বয়ং।

'জনসাহিত্য' কথাটি একটু ব্যাখ্যাযোগ্য। কবিগান, পাঁচালী পালা ও সঙ্গীতকে সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের মধ্যে গণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু উহাদের রচক, রচনারীতি, রচনার বিষয়গুলি লোক (folk) সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা মুখ্যতঃ ইংরাজীপ্রভাবমুক্ত শিক্ষিত লোকের রচনা, বিষয় মূলতঃ প্রচলিত পুরাণাদি থেকে সমাহৃত, রচনাভঙ্গী চিরাগত। অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিদের দ্বারা মৌখিকভাবে গ্রাম্য বিষয়ে পল্লীর জনগণের জন্য ইহা রচিত নয়। ইহা জনগণের সকল শ্রেণীর জন্য রচিত popular literature। এই হেতু উনবিংশ শতকের ইংরাজীপ্রভাববর্জিত এই শাখাকে জনসাহিত্য বলাই সঙ্গত মনে করি।

দাশরথির বটতলা সংস্করণে দশ খণ্ডে ৫৬ খানা পাঁচালীপালা প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর বঙ্গবাসী থেকে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় চতুর্থ সংস্করণে সঙ্গীত-সংগ্রহ বাদে ৬৪টি পালা প্রকাশ করেছিলেন। অশ্লীলতা অভিযোগে কতকগুলি পালা বর্জন করেছিলেন হরিমোহন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দাশরথির সমগ্র রচনা একখণ্ডে (১৯৬২) প্রকাশিত হয়েছে। এখানে পালার সংখ্যা ৬৮, গানের স্বতন্ত্র সংগ্রহ আছে। যতটা জানা,—এটি-ই দাশরথির পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ।

অমৌলিক ও মৌলিক দুই ধরনের রচনাই করেছেন দাশরথি। অমৌলিক মানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে রচনা। তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, রামবিষয়ক, শিব-শক্তি গঙ্গাবিষয়ক পালা আছে। মৌলিক মানে (১) সমসাময়িক ঘটনামূলক ও (২) পরম্পরাগত ভাবমূলক রচনা। প্রথমটির উদাহরণ -বিধবাবিবাহ ও কর্তাভজা এবং দ্বিতীয়টির বসন্ত আগমনে বিরহিণীদের বিরহবর্ণন, নলিনীভ্রমর পালা ইত্যাদি। সঙ্গীত-সংগ্রহ বাদে মোট ৬৮টি পালার মধ্যে ৫২টি অমৌলিক ও ১৬টি মৌলিক রচনা। কোন কোন বিষয়ে একাধিক পালাও আছে। প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয় স্মরণযোগ্য। আখড়াই, হাফ্-আখড়াই, কবি, পাঁচালী—এই সব জন-সঙ্গীত-সাহিত্যের মধ্যে বিষয়গতভাবে মোটা বিভাগ সর্বত্র দুইটি—একটি পৌরাণিক দেবদেবী বা দেবোপম পৌরাণিক ব্যক্তির কাহিনী, অপরটি লৌকিক মানুষের নানা সমস্যা। মনে রাখতে হবে খেউড় গান বিরহের-ই স্থূল রূপমাত্র।

গান পাঁচালীর কেবল অপরিহার্য অঙ্গ নয়—একেবারে মুখ্য অঙ্গ। পাঁচালীতে বর্ণনার বা আবেগের চরম মুহূর্তটি গানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রারম্ভিক সঙ্গীত, পালার অঙ্গ হিসাবে দু একটি ক্ষেত্রে ছাড়া, দাশু রায়ের পাঁচালীতে পাওয়া যায় না। অথচ শুরুতে বন্দনা-জাতীয় একটি গীত হওয়া পদ্ধতি। এসব ক্ষেত্রে গায়ক ছুট গান, অর্থাৎ পালার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত নয় এমন ভাবদ্যোতক কোন স্বতন্ত্র গান গাইতেন। গৌরচন্দ্রিকা যেমন লীলাকীর্তনের অপরিহার্য আদ্য সঙ্গীত, তেমন রীতি পাঁচালীতে নেই,

কিন্তু অন্ত্য সঙ্গীত অপরিহার্য। সঙ্গীতসমূহ মুখ্যতঃ সংলাপের মুহূর্তকে আবেগঘন করার জন্য বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশে ব্যবহৃত হয়েছে। দাশরথির বিভিন্ন পালাতে গণ-চরিত্র বাদে মুখ্য চরিত্রের সংখ্যা প্রায় ২৩০টি। তার মধ্যে ৮।১০টি চরিত্র ছাড়া কবি সকলের মুখেই গান দিয়েছেন—এমন কি দুর্বাসা-দুর্যোধন-শূর্পনখা-তাড়কাকেও বঞ্চিত করেন নি। সাকুল্যে গানের সংখ্যা প্রায় ৮৮০-টির মতো। গানগুলির সুর তাল সুনির্দিষ্ট। মোট ৯২টি রাগরাগিণী ও ২৬টি তালের সূচনা দিয়েছেন দাশরথি। ভণিতাযুক্ত গীতের সংখ্যা কম। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভণিতার যে রীতি প্রচলিত ছিল, উনিশ শতকে কবি, পাঁচালী টপ্পাদি গানে তার ব্যবহার তেমন লক্ষিত হয় না। তাছাড়া চরিত্রের সংলাপে নিবেদিত গানে ভণিতা না থাকাই সঙ্গত। এ নিয়ে কিছু কিছু অসুবিধাও দেখা দিয়েছে। 'ননদিনী বল নগরে'—এ-জাতীয় দাশরথির শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতও কোন সংগ্রহে অন্য কবির নামে সংকলিত হয়েছে।

সংসাহিত্যের একটি সামাজিক কর্তব্য লোকশিক্ষা দান। পুরানো দিনের, এমন কি উনিশ শতকের লোকশিক্ষার মূল তাৎপর্য ছিল ধর্মশিক্ষা। নানাবিধ মানবিক গুণের বিষয়ে মুখ্যতঃ ভগবদ্-ভক্তির দিকে মানুষের চরিত্রকে আকর্ষণ করার দায়িত্ব ছিল ধর্মশিক্ষার মুখ্য কর্ম। এই দিক থেকে পাঁচালী প্রচারমূলক সাহিত্য। সুতরাং পাঁচালীর সঙ্গীতগুলিও মুখ্যতঃ ভক্তিভাবসমৃদ্ধ। তাই দেখা যায় দাশরথির রচিত পৌনে নয় শতাধিক গানের মধ্যে লৌকিক পালার গীতগুলি এবং পৌরাণিক পালার শতকরা তিন ভাগেরও কম হালকা গান—সাকুল্যে অনুমান পাঁচ শতাংশ পদে সব গানই মোটামুটিভাবে ভক্তিমূলক। এই গীতসমূহকে যথাসম্ভব শ্রেণীবিভাগ করে আলোচনা করা যাক।

দাশরথির ভক্তিগীতের মধ্যে শ্যাম, শ্যামা, শিব, গঙ্গা, গণেশ, রাম, অন্যান্য অবতারগণ, সরস্বতী, ব্রহ্মা ও আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক গান আছে। প্রধান গীতগুলিকে কৃষ্ণগীতি, শ্যামাসঙ্গীত ও আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক গান—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সুরের প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কেবল উচ্চাঙ্গের ভাবের সহিত কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত গীত হিসাবে দাশরথির অন্ততঃ ৭০টি গান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কালজয়ী হবে এবং মনে করি যদি ভক্তিগীতির সংকলন হয় তাতে এইগুলি সংকলন না করলে অপূর্ণতা থাকবে। গীতের আলোচনার পূর্বে ভূমিকারূপে দুটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যাক। পাঁচালী গানের, বিশেষতঃ দাশরথির, কঠোর সমালোচক ছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন—'শ্রুতিসুখকর কিন্তু কুরুচিদুষ্ট গীতরচকদের মধ্যে দাশরথি সর্বশ্রেষ্ঠ।' গীত-রচক অর্থে পাঁচালীলেখক। কিন্তু তার পরেই আচার্য সেনের মন্তব্য—'দাশুর পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি না কেন, তাঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক গানগুলির প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিব।' ['বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৫৪৭]। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব দাশরথির গান শুনতে ভালবাসতেন ও নিজে গাইতেন। কথামৃতের সাক্ষ্য অনুসারে নিম্নলিখিত গানগুলি ঠাকুর আস্বাদন করতেন। আমার কি ফলের অভাব (১-১-৯), হৃদি বৃন্দাবনে যদি কর বাস কমলাপতি (২-৩-৪); দোষ কারু নয় গো মা (২-৩-৩); এ কি বিকার শংকরী (২-৩-৩);

জীব সাজ সমরে (২-৩-৫) ; ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে (৩-১১-৩) ; জাগ জাগ জননী (৫-৪-১) ; কি করলে হে কান্ত! (৫-৬-২) ; শুনেছি রাম তারক ব্রহ্ম (৫-৬-২)।

কৃষ্ণগীতির সীমা একটু সম্প্রসারণ ক'রে রামচন্দ্র ও বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার সম্বন্ধে গানগুলি মিলিয়ে—তাকে নূতন নাম 'বৈষ্ণবপদাবলী' দিলে কোন ক্ষতি হয় না। সমগ্রভাবে বিচার করলে দাশরথির বৈষ্ণবপদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয় এবং প্রায় পনর আনা রাগানুগা ভক্তিরসে জারিত। তবু সমালোচক মাত্রেই একমত যে সামগ্রিক বিচারে বৈষ্ণবপদসমূহের মধ্য দিয়ে দাশরথির কবিত্বশক্তির তেমন বিকাশ নেই যেমনটা হয়েছে শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের যে ধারা উনবিংশ শতকে পেঁৗছেছিল, তার আবেগ ও হৃৎস্পন্দন আপেক্ষিক মূল্যমানের দিক থেকে অনেক ন্যূন হলেও কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচনাবলীর মধ্যে তা যতখানি ঝংকার তুলতে পেরেছিল, দাশরথির বৈষ্ণবপদে নানা কারণে তা পারেনি। এ কথার অর্থ নিশ্চয়ই এমন নয় যে দাশরথির বৈষ্ণবপদগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা। সামগ্রিকভাবে সব বৈষ্ণবপদগুলি খুব উচ্চমানের না হলেও কয়েকটি পদ যে ভাব-ঐশ্বর্যে ও কাব্য-সৌন্দর্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—সব রসের পদই রচনা করেছেন দাশরথি—তবে স্বাভাবিকভাবেই মধুররসের পদসমূহ শুধু সংখ্যায় গরিষ্ঠ নয়, ঔজ্জ্বল্যেও বরিষ্ঠ। 'আয়রে কানাই আয়রে গোষ্ঠে রজনী পোহাইল' [শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা-১]; 'আর কেহ নাই, ও কানাই হোলো ভাই জীবনান্ত' [গোষ্ঠলীলা ও ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ]—এই সব সখ্যরসের গান এবং 'কত বলি রে গোপাল চাঁদ ধরব কেমনে' [গোষ্ঠলীলা-২]; 'আমার একখাটি পাল আজি রেখে গোপাল, গোপালের গোপাল লয়ে যা ছিদাম' [গোষ্ঠলীলা-২] প্রভৃতি বাৎসল্যরসের পদসমূহ প্রশংসনীয়।

মধুররসের গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরাধার চরিত্রটির ভূমিকা আবশ্যক। দাশরথি রচিত গম্ভীর প্রকৃতির নায়ক-নায়িকার মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও মধুর। খণ্ডে খণ্ডে রচিত ও সংস্রব-শূন্য স্বতন্ত্র পালাগুলির মধ্যেও শ্রীমতীর অখণ্ড ভাব ও চরিত্রের ধারাবাহিকতা অনেকখানি সাবলীল ও অক্ষুণ্ণ। বৈষ্ণবপদকর্তাগণ শ্রীমতীকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন নি। ফলে দ্রষ্টা ও দৃষ্টি ভেদে দৃশ্যও বিভিন্ন হয়েছে। এই হেতু বিদ্যাপতির রাধা নবীনা, চতুরা, নিপুণা, অভিসারিকা, দেহগন্ধে মুগ্ধা, মিলনে উচ্ছলা—আর চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমে প্রবীণা, প্রগাঢ় আবেগে বর্ষণোন্মুখ মেঘের মতো, পূর্ণ যোগিনী, বিরহে উচ্ছলা, মুগ্ধতা, চাতুর্য, প্রগল্ভতা, বিরহবেদনা, ব্যাকুলতা, আর্তি প্রমুখ যাবতীয় ভাবের মধ্যে যেমন কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাধিকার মুখ্য রূপ প্রেমোন্মাদিনী—তেমনি দাশরথির রাধার প্রধানতম রূপ অভিমানিনী। এই মূল সূত্র দিয়ে পূর্বরাগ, অভিসার, মান, বিরহ, মিলনাদি নানা ফুলের গ্রন্থনে রচিত হয়েছে রাধাচরিত্রমালিকা। 'ও কে যায় গো কাল মেঘের বরণ' [গোষ্ঠলীলা-১], 'সই গো ডুবিলাম ঐ রূপসাগরে। এই গোকুল নগরে আছে কে হেন সুহৃদ আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে' [বস্ত্রহরণ], 'হরি হেরিতে হরিসোহাগিনী চঞ্চল চরণে চলে' [উদ্ধবসংবাদ] প্রমুখ পদগুলি সুন্দর। 'ননদিনি গো বল নগরে। ডুবেছে রাই

রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে।' [বস্ত্রহরণ] এতজ্জাতীয় পদগুলির মধ্যে বিদ্রোহিণী রাধার আকস্মিক চোখঝলসানো আবির্ভাব বিস্মিত করে। প্রার্থনাসূচক পদগুলি দাশরথির শ্রেষ্ঠ রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—মনে হয় চমৎকারিত্বে ও ভাবসৌন্দর্যে তাঁর বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম। একটি গীতের উল্লেখ করি। বৈষ্ণবধর্মের মূল আকৃতি এই গীতের রূপকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে—

হৃদি বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি
ওহে ভক্তিপ্রিয়। আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী॥
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমায় ধর ধর জনার্দন পাপ-ভার-গোবর্দ্ধন
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥
বাজায়ে কৃপাবাঁশরী মনধেনুকে বশ করি
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্ঠে, পূরাও ইষ্ট, এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ যমুনাকূলে আশাবংশীবটমূলে
সদয়ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি॥
যদি বল রাখালপ্রেমে বন্দী আছি ব্রজধামে
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে
দাশরথি॥ [কলঙ্কভঞ্জন]

সমগ্র রচনা কোন কবিরই উৎকৃষ্ট হয় না। রসোত্তীর্ণ গীতের সংখ্যা দাশরথির খুব বেশি নয়। কিন্তু কয়েকটি রচনা শুধু উপাদেয় নয়, অনবদ্য। মৃদুগন্ধী ভূমিচম্পার বাগানে দুই-চারটি দীর্ঘবৃন্ত উগ্রগন্ধী রজনীগন্ধার স্তবকের মতো সহজেই চিত্তকে আকৃষ্ট করে।

দাশরথির সর্বশ্রেষ্ঠ গীত শ্যামাসঙ্গীত। দুর্গা বিষয়ক গীতগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। শ্রেণী বিভাগ করলে এর মধ্যে বর্ণনা মুখ্যত: যুদ্ধরতা দেবীর রূপ, আর্তি ও প্রার্থনা, আগমনী ও বিজয়া—এই তিনটি শাখা পাওয়া যায়। 'কার রমণী নাচে সমরে', 'ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী ভববিপদভঞ্জিনী'; 'বামাকে কে পারে চিনতে'; 'মহাশ্মশানে কে মহাকালবুকে মহাসুখে মেয়ে কে বিহরে'; 'লম্বিত গলে মুণ্ডমাল, দন্তিতা ধনী মুখ করাল', 'ত্বং মায়ারূপিণী দুর্গে'—এইগুলি রূপবর্ণনার নিদর্শন। মামুলি ধরনের রচনা। কিন্তু প্রার্থনা ও আর্তি বিষয়ক গানগুলি বিশেষ আন্তরিকতা- ও তাৎপর্য-পূর্ণ। 'জাগ জাগ জননি', 'কালি অকূলে কূল দেখিনে'; 'এ কি বিকার শংকরী'; 'আমি আছি গো তারিণি ঋণী তব পায়'; 'মা সেদিন কবে প্রভাত হবে'; 'মোরে হের গো তারিণি কৃপানেত্রে'; 'কত পাতকী তরে', 'শিবে সম্প্রতি, ওমা'; 'কর কর নৃত্য নৃত্যকালি একবার মনসাধে রণক্ষেত্রে মা মোর হৃদয়মাঝে', 'হের কালকান্তে মা ত্বং সময়গতং শরণাগতং'; 'মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি'; 'দুর্গে পার কর এ ভবে', 'দিন দিলে না মা দীনতারিণি'; 'দোষ কারো নয় গো মা' প্রভৃতি শ্যামাসঙ্গীতগুলি অনুপম।

শ্যামাসঙ্গীত রচনা করতে বসে দাশরথি যেন খানিকটা আত্মহারা হয়ে যেতেন। তাঁর শাণিত শ্লেষ, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, শব্দযোজনাতে অনুপ্রাসের দুর্জয় মোহ, রুচির স্থূলতা সব যেন অন্তর্হিত হয়ে একটি ভাবমুগ্ধ সাধকের শুভ্রশ্রী উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠত। দুর্বাসা-দৃষ্টি দাশু রায়ের সর্ববিধ দোষ-ত্রুটির প্রতি ক্ষমাহীন বিদ্রূপের ঝকঝকে রূঢ়তার তুষার যেন ভক্তি-সূর্যোত্তাপে সহসা ঝর্না হ'য়ে গলে পড়ত। কবি আত্মদর্শন করে যেন শিশুর মত আর্তনাদ করে উঠলেন –

'দোষ কারু নয় গো মা,
আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।'

এই সঙ্গীতটি সম্বন্ধে দাশরথি রায়ের কঠোর

সমালোচক আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভিমত উদ্ধার করি—"দোষ রামের শ্যামের, আমি তো সম্পূর্ণ নির্দোষ। প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গের দোষ গাহিয়া গাহিয়া জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিয়াছি। কিন্তু এমন দিনও আসিতে পারে, যখন পরচ্ছিদ্র-অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর গতি ফিরিয়া যায় এবং নষ্ট-যুক্তি দ্বারা স্বীয় কার্য সমর্থনের চেষ্টা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়; তখন এই মায়াময় সংসারচিত্র চক্ষু হইতে সরিয়া পড়ে এবং নিঃসহায় হইয়া জগন্মাতার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া মানুষ নিজের মূর্তি দেখিয়া ভয় পায়, এই পুণ্যক্ষেত্রে রিপুপরবশে নিজে কূপ কাটিয়া ডুবিয়াছি, কাহাকে দোষ দিব? 'দোষ কারু নয় গো মা'—বলিয়া সরল মর্মভেদী ক্রন্দনে তখন দয়ার জন্য, ক্ষমার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ি, অভিমানস্ফীত মানুষ প্রকৃতির মহা-করুণা-রূপিণী মাতৃরূপিণী শক্তির নিকট তখন একটি নিঃসহায় শিশুর ন্যায় কৃপাভিখারী। এ ভাবের গান দাশরথির অনেকগুলি আছে।" [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সং পৃঃ ৫০২]

দাশরথির আগমনী সঙ্গীত—'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল', 'কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী', 'গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এল পাষাণী, তোর ঈশানী'; 'কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী' প্রভৃতি এবং 'প্রাণ উমা, মাকে কোন প্রাণে মা, বললি বিদায় দে মা', 'গিরি, যায় হে লয়ে হর প্রাণকন্যা গিরিজায়', 'ওরে রজনি, আজি তুই পোহালে প্রাণান্ত' প্রভৃতি বিজয়াসঙ্গীতগুলি এক সময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

আত্মতত্ত্ববিষয়ক গান বাংলাসঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারা। বৈষ্ণবীয় পরিভাষায় ইহাকে বলে মনঃশিক্ষা। নিজের মনকে সম্বোধন করে মুখ্যতঃ আত্মতত্ত্ববিচার, ইহার মূলকথা। এই পর্যায়েও দাশরথি অনেকগুলি রসোত্তীর্ণ সঙ্গীত রচনা করেছেন। 'জীব সাজ সমরে'; 'মনরে বিপদে ত্রাণ পাবার হলি নে'; 'জীব সাজ সমরে: মম মানস শুক পাখি'; 'ওরে রসনা রস না বুঝে কেন তুমি কুরসে মজেছ ভাই'; 'কুসঙ্গ ছাড়রে ও মোর পামর মন', 'জীবমীন রে জীবন গেল', 'ভেবে দেখো মন আমার', 'জীব রে আর কদিন দেহে জীবন রহিবে'; 'শ্রীকান্তশ্রীচরণ ভাবরে মন'; 'চলরে মানস রসশ্রীবৃন্দাবনে' 'গেলরে দিন একান্ত', 'কি কররে মন অনিত্য ভাবনা'; 'গেলরে দিন ভবের হাটে', 'মজনা মজনা মন জানকীবল্লভপদে' প্রভৃতি ঊনবিংশ শতকের উত্তরার্ধে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

দাশরথির ভক্তিঋদ্ধ চিত্তে শ্যাম-শ্যামা অভেদভাবে অনুভূত হলেও পরব্রহ্মের মাতৃ-মূর্তিটিই যেন অধিকতর অন্তরঙ্গ ছিল। অষ্টাদশ শতকে মাতৃসাধক রামপ্রসাদ যে ধারাটির উৎসমুখ উন্মোচন করে 'মা' 'মা' ডাকের বন্যাতে সমস্ত দেশ প্লাবিত করে দিয়েছিলেন, কমলাকান্ত প্রমুখ উত্তরকালের মাতৃ-সাধক-কবিমণ্ডলী যাতে বিচিত্র ভক্তির হিল্লোল তুলেছিলেন—সেই শাখার ঊনবিংশ শতকের প্রসারিত কালের প্রতিনিধি দাশরথি রায়। কৃষ্ণকমল গোস্বামীকে যে অর্থে ঊনবিংশ শতকের বৈষ্ণব-গীতিকাব্য-ধারার উত্তরসাধক ও শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়, সেই অর্থে উক্ত শতাব্দীর শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতাদিগের মধ্যে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী দাশরথি রায়। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করে প্রবন্ধটি সমাপ্ত করি—'রামপ্রসাদের গানের ন্যায় তাঁহার (দাশরথির) গান ও গানের সুর সহজ,

এজন্য লোকে আগ্রহ সহকারে উহা শিক্ষা করিত। সেকালের প্রাচীনদের মধ্যে দাশু রায়ের গান জানে না এমন লোক নাই বলিলেই হয়। এখনো অনেক ভিখারী মধ্যাহ্ন-কালে গৃহস্থ প্রাচীনা কামিনীগণের ফরমাস মত দাশু রায়ের ঠাকরুন বিষয়ক গান গাহিয়া জীবিকার সংস্থান করে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস দেবলীলা লিখিয়া যেমন বাঙ্গালার আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন হইয়াছেন, দাশু রায় সেইরূপ বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দজন্য সহজ নূতনরূপ সঙ্গীতামোদ প্রদান করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। কি ইতর, কি ভদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সকলেই দাশুর গানের পক্ষপাতী। এইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের হয়?' [বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সং, পৃঃ ২৩১]।

বাংলা সমালোচনাসাহিত্য

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ*

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটকের মতো সমালোচনাসাহিত্যও অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ। বাংলা ভাষার ইতিহাসের মতোই সংস্কৃত এবং ইংরেজী এই দুই সাহিত্যের আদর্শে এর ক্রমবিকাশ। ইংরেজীর মাধ্যমে গ্রীক, রোমান, ফরাসী, জর্মন, আমেরিকান ও রুশ প্রভাব নানাদিক থেকেই আমাদের সমালোচনাসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু সমালোচনা এখনও খুব অল্প সাহিত্যিকেরই একনিষ্ঠ মনোযোগ দাবি করতে পারে। শুধুমাত্র সমালোচনাকেই সাহিত্যব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এমন লেখক উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সংখ্যায় অতি অল্প। হয়তো এই কারণেই বাংলা সমালোচনাসাহিত্য এখনও স্থিতধী প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করতে পারে নি। বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও মননের পটভূমির সঙ্গে শুধুমাত্র লেখার দ্বারা জীবিকা-অর্জনের যে সুবিধা থাকলে কোনো লেখক শুধুমাত্র সমালোচনাকে অবলম্বন করেই সরস্বতীর অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, সে সুবিধা বাংলা সাহিত্যে নেই। তার জন্য যোগ্য লেখকের অভাব কিছুটা দায়ী। অনেকটা দায়ী পাঠকমণ্ডলীর অভাববোধের অভাব। এমনিতেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বিদ্যার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা সম্বন্ধে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। এখন তো ভাষাশিক্ষা নিয়ে বিতর্কের ফলে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে মাতৃভাষার প্রয়োগ আরো অনিশ্চিত। সরকারী সিদ্ধান্ত যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে বাংলায় উচ্চশিক্ষার গ্রন্থ প্রকাশই খুব কম দেখা যায়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ সমালোচনার পটভূমিতে যে মননজাত বিদ্যাবিত্তার একান্ত

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে গবেষণা-গ্রন্থের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি লিট. উপাধি প্রাপ্ত। 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ', 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য'—ইঁহার অপর তিনটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

প্রয়োজনীয়, তা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুবই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া সৃজনমূলক সাহিত্য—গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদির বাজার যেখানে সীমাবদ্ধ, সেখানে সমালোচনা-মূলক সাহিত্যের কাটতি তো স্বাভাবিক-ভাবেই কম হবে। সামান্য কিছু লেখকের বই বাদ দিলে গল্প-উপন্যাসের বিক্রিও এখন আশানুরূপ নয়, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার প্রয়োজনে না হলে সাধারণভাবে সমালোচনাগ্রন্থ বিক্রি হওবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। এ সব সত্ত্বেও বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্যের সম্ভার খুব উপেক্ষণীয় মনে হয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও রাজেন্দ্র-লাল মিত্র সমালোচনার ইতিহাসে স্মরণীয় হলেও প্রথম যথার্থ সাহিত্য-সমালোচক নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে মধুসূদনের পত্রাবলীতেই আমরা ইংরেজী ভাষায় বিশ্ব-সাহিত্যের পটভূমিতে সৃজ্যমান বাংলা সাহিত্যের আলোচনা পেয়েছি। কিছুটা পেয়েছি তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কোনো কোনো সনেটে। কিন্তু বঙ্কিমের মতো ক্ষুরধার বিশ্লেষণীশক্তি নিয়ে সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা পূর্ববর্তীরা কেউ করেন নি। হয়তো সে বিষয়ে এই দিক থেকে ভাবাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অথচ বঙ্কিমের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলিও মূলতঃ বিভিন্ন সময়ে লেখা বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধরাজি—কোনো একটি বা একাধিক সাহিত্যকৃতি বা সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি তারা করতে পারে না। কিন্তু এই 'বিবিধ প্রবন্ধে'র মধ্যেও আমরা সাহিত্যের স্বাদ, সৌরভ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে এক প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত মননালো-কের পরিচয় পাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচকসত্তার দুটি প্রান্ত—সৌন্দর্যচেতনা ও নীতিজ্ঞান। স্বভাবতঃই তাঁর ধারণায় লেখার দ্বারা যদি কারু উপকার হয় তবেই লেখা উচিত। এই নীতিসচেতনতা বঙ্কিমের উপন্যাসে বাস্তব ও কল্পনার দ্বন্দ্বে অনেক বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শেষ অবধি জয়ী হয়েছে তাঁর সৌন্দর্যমুগ্ধ শিল্পিসত্তা। সমকালীন ব্রাহ্ম নীতিবাদের প্রভাব সেকালের আর সব শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্রকেও প্রভাবিত করেছে এবং বঙ্কিমোত্তর বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে এই নীতিবাদী প্রভাবই দীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছে। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সর্বগ্রাসী মদমত্ত-তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে প্রখর নীতি-বোধের এই দৃঢ়তা একসময়ে আমাদের সাহিত্যে প্রয়োজনীয় ছিল কিনা, সেকথা ভেবে দেখবার মতো। কিন্তু বঙ্কিমপূর্বযুগে মধুসূদনের পত্রাবলীতে আমরা একালেরই মতো সাহিত্যকে বিশুদ্ধ শিল্প হিসাবে বিচারের প্রবণতাই দেখতে পাই।

'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'গীতিকাব্য', 'শকুন্তলা মিরান্দা ও দেস-দিমোনা'-জাতীয় প্রবন্ধে বঙ্কিম যে বিশ্লেষণী-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তা অমর উদাহরণ। এ সব প্রবন্ধের বক্তব্য সবই যে আজকের দিনে স্বীকার্য তা নয়। কিন্তু সাহিত্যের রসগ্রহণে ও তুলনা-মূলক সাহিত্যবিচারের পদ্ধতিতে বঙ্কিমের এ আদর্শ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। খুব কাছের দিনের লেখকদের মধ্যে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর আপাত অনীহা বা হেমচন্দ্র সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস আমাদের বিস্ময়কর ঠেকলেও ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ মিত্র বা অগ্রজ

সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর আলোচনার নিরপেক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি যে কোনো সাহিত্যসমালোচকের বরণীয় আদর্শ। বঙ্কিম-প্রভাবিত পরবর্তী সমালোচকদের মধ্যে এদিক থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই বিশেষভাবে বরণীয়। চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্কিমবৃত্তের সমালোচকদের দান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যই উল্লেখ্য।

সমালোচকের অন্যতম প্রধান কাজ বিশ্লেষণ, আর একটি তাঁর প্রতিভার লক্ষণ—সাহিত্যসমালোচনার মাধ্যমে জীবন ও জগতের অন্তর্নিহিত অথচ এতকাল অলক্ষিত মর্মবাণী আবিষ্কার। সেদিক থেকে বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান অতুলনীয়। বঙ্কিমপ্রতিভার উত্তরাধিকার নানাদিকের মতো রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্যেও দেখা দিয়েছে বটে, তবে যে নিবিড় অনুভূতিময় জীবনস্পন্দন রবীন্দ্র-সমালোচনাসাহিত্যে ধ্বনিত, তার তুলনা কিছুটা ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গে করা গেলেও ব্যাপ্তি ও গভীরতায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য আমাদের কাছে অনেক বেশী ব্যঞ্জনাবহ। একদিকে উপনিষদের অখণ্ড অদ্বয় চেতনা আর একদিকে ইংরেজী রোম্যান্টিক কাব্যাদর্শ—এ দুয়ের সম্মেলনে সমালোচক রবীন্দ্রমানস অনেক সময় সমকালীন বাস্তব-বাদী আন্দোলনকে স্বীকারই করতে পারে নি, একথা সত্য। কিন্তু তাঁর নিজস্ব রুচি-সম্মত সাহিত্য-অনুধাবনের ক্ষেত্রে যে অতুল প্রসারী কবিদৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা যেমন সৃজনধর্মী সাহিত্য, তেমনি মননধর্মী সমালোচনা। 'পঞ্চভূত', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার ও সাহিত্যানুভবের 'রসোদগার' প্রতিভার পূর্ণ নিদর্শন। তাঁর 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধগ্রন্থ দুটি অনেক পরিমাণে এ যুগের সাহিত্যচিন্তার দিশারী। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাহিত্যধারার সঙ্গে তাঁর প্রাণসম্বন্ধের পরিচায়ক 'সাহিত্যের স্বরূপ' পুস্তিকাটি। লোকসাহিত্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের মগ্নচৈতন্য থেকে জাতীয় আত্মপরিচয়-উপলব্ধিতে অসামান্য সাফল্যের অধিকারী।

বঙ্কিমচন্দ্রের শাণিত যুক্তিপরম্পরা রবীন্দ্র-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য নয়। এমন কি কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ আত্মমগ্নভাবে সাহিত্য প্রসঙ্গ করতে করতে নিজের বক্তব্য নিজেই খণ্ডন করেছেন। তবু সাহিত্যবোধের উন্নততম মানদণ্ডের আদর্শে বাংলা সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁর মহিমা।

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা অনেক হয়েছে, আর সে সব সমালোচনাই যে ভ্রান্ত, এমন কথা বলা কঠিন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিপিনচন্দ্র পাল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের কথা এক্ষেত্রে যেমন বিশেষভাবে মনে পড়ে, তেমনি রবীন্দ্রানুরাগী সমালোচক-গোষ্ঠীও সেকালে একে একে দেখা দিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশপর্বে বাংলা-সমালোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, অজিত চক্রবর্তী প্রমুখ দেশবিদেশের সাহিত্যপারঙ্গম ব্যক্তিদের রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চা এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর সবুজপত্রগোষ্ঠী রবীন্দ্রচর্চা ও সামগ্রিকভাবে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেই মনন ও প্রকাশের স্বাতন্ত্র্যে বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও

রসতত্ত্বের আলোচনার দিক থেকে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুশীলকুমার দে, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রমুখ মননশীল সমালোচকদের কথা সর্বাগ্রে মনে আসে। সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আধুনিক সমালোচনা দূরে সরে এলেও এ পদ্ধতির নিজস্ব সার্থকতা তাঁদের আলোচনার মাধ্যমে পাঠক-মণ্ডলীকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাহিত্য-সমালোচনার ভাষাও যে কতো প্রাঞ্জল ও কাব্যগুণান্বিত হতে পারে অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নির্মম সমালোচনায় একদা 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বস্তুতঃ এ পত্রিকার বিরুদ্ধতাও একাধিক সাহিত্যিককে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই গোষ্ঠীতে মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো সাহিত্যিক সমালোচকেরাও দেখা দিয়েছেন। সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে একটু বেশী পরিমাণে পাশ্চাত্য মনীষীদের উপর নির্ভর করলেও নিজস্ব রসবোধ ও বিশ্লেষণীশক্তিতে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে (বিশেষভাবে প্রথমোক্ত দু'জনকে) যে ভাবে মোহিতলাল আমাদের বোধের জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেজন্য বিশেষ সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। 'কবি মধুসূদন', 'বঙ্কিমবরণ', 'রবিপ্রদক্ষিণ' তাঁর বহুপ্রশংসিত গ্রন্থমালা। রবীন্দ্রপূর্ব বা সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' ও 'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থ এখন অবধি শ্রেষ্ঠ সমালোচনার নিদর্শন। মধুসূদন, বঙ্কিম এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ—প্রমথনাথ বিশীরও আলোচনার প্রধান অবলম্বন। 'রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ', 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ', 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', 'রবীন্দ্রসরণি', 'বঙ্কিমসরণি', প্রভৃতি সমালোচনাগ্রন্থ ক্ষুরধার বিশ্লেষণ ও অতন্দ্র সৌন্দর্যদৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত আর এক জাতীয় সার্থক সমালোচনার নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমপ্রতিভার প্রসারিত প্রভাবের দিক থেকে এ দু'জনের পাশাপাশি রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের স্বল্প হলেও সুলিখিত প্রবন্ধাবলীর কথা স্মরণীয়।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বাংলা কথাসাহিত্যের দু'জন প্রথম সারির সমালোচক। শ্রীকুমার বাবুর 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', 'বাংলাসাহিত্য-পরিক্রমা', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসংগমে' প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের সমালোচনার ধারাকে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত করেছে। যে আধুনিক মননের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুবোধ সেনগুপ্ত ইংরেজীতে বার্ণার্ড শ' থেকে বাংলায় শরৎচন্দ্র, রাজশেখর বসু অবধি আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন, আজকের দিনেও তার নব নব বিকাশ বিস্ময়কর। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সাহিত্যপ্রসঙ্গে যখনই যা আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে তাঁর দৃষ্টির মৌলিকতা ও প্রকাশের বিচিত্র-স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। রবীন্দ্র সাহিত্যা-লোচনায় একালের আর তিনজন বিশিষ্ট সমালোচক—ক্ষুদিরাম দাস, সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং জগদীশ ভট্টাচার্য। এঁদের বৈদগ্ধ্য ও সুপরিণত রসদৃষ্টি সমালোচনাসাহিত্যের সম্পদ।

'বাংলাসাহিত্যের একদিক', 'উপমা কালিদাসস্য', 'ত্রয়ী' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যচেতনা নিয়ে নূতন ধরনের আলোচনাভঙ্গীর সূত্রপাত হয় ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের দ্বারা। তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি'

'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' ও 'ভারতীয় শক্তি-সাধনা ও শাক্তসাহিত্য' প্রভৃতি বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও শাক্ত ভাবধারার বিচারবিশ্লেষণে অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন।

ইংরেজী সাহিত্যে আধুনিক কবি টি. এস. এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার প্রমুখের মতো একাধারে কবি ও সমালোচক আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকজন দেখা দিয়েছেন। মোহিতলাল, কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী—এঁদের যদি একটু অতি-আধুনিকপূর্বযুগের কবি ও সমালোচক হিসাবে ধরি, তাহলে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—এ তিনজনকে অতিআধুনিক যুগের কবি ও সমালোচকরূপে চিহ্নিত করা যায়। 'পরিচয়' পত্রিকাকে অবলম্বন করে সুধীন্দ্রনাথ বাংলা সমালোচনার যে সমুন্নত মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন তার যোগ্য উত্তরাধিকারী আজ অবধি কেউ আসেন নি। 'স্বগত' এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থ দুটির ভাষাগত জটিলতা অতিক্রম করতে পারলে সাহিত্যচিন্তা ও সমালোচনার এক আশ্চর্য উদাহরণ মনে হবে। আর এ জাতীয় গদ্যরীতি যে বাংলা মননসাহিত্যে ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশিষ্ট উদাহরণ সেকথাও স্মরণীয়। যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের 'ভাববার কথা' প্রবন্ধগুচ্ছ বা 'বর্তমান ভারত' পড়েছেন, তাঁরা বাংলা গদ্যরীতির এই বিশিষ্টতা স্বামীজীর রচনায় আগেই পরীক্ষিত হ'তে দেখেছেন।

মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারা অবলম্বনে বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে নূতন জীবনসত্যকে যাঁরা উদ্‌ঘাটন করেছেন তাঁদের মধ্যে নীরেন রায়, গোপাল হালদার, অরবিন্দ পোদ্দার, শীতাংশু মৈত্র প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পটভূমিতে সাহিত্যের স্বরূপবিশ্লেষণে নূতন ধরনের বিশ্লেষণীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তবে নিরপেক্ষ সাহিত্যবিচারে এঁদের মধ্যে গোপাল হালদারই সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আর দুজন প্রখ্যাত সমালোচক—আদর্শনিষ্ঠায় স্বতন্ত্র নারায়ণ চৌধুরী এবং দেশবিদেশের সাহিত্য-সমুদ্রে অভিস্নাত অমলেন্দু বসু।

প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগের পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে আশুতোষ ভট্টাচার্য ও জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর গবেষণাধর্মী রচনাবলী বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের দিগন্তকে বহুদূর প্রসারিত করেছে। বাংলা সাহিত্যের সমা-লোচনামূলক ইতিহাস লিখে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসমালোচনায় বিশিষ্ট-স্থানের অধিকারী। বিশ্লেষণনৈপুণ্যে মোহিত-লালের যোগ্য উত্তরসূরী ভবতোষ দত্তের সমালোচনাসাহিত্য। সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বাংলা সাহিত্যের ধারা বিশ্লেষণে তারাপদ ভট্টাচার্য আর এক চমকপ্রদ সমালোচক। প্রাক্‌রবীন্দ্রযুগ থেকে আধুনিক যুগ অবধি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিরলস নিপুণ সমালোচক কবি হরপ্রসাদ মিত্র। এঁদের সবার লেখায় তথ্য ও তত্ত্বের বিপুল সমাবেশ।

বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের প্রত্যক্ষ-লেখক না হ'লেও যাঁদের চিন্তাধারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও শরৎচন্দ্রের কথা বিশেষভাবে মনে জাগে। বাংলা চলতিভাষার ভবিষ্যৎ

গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যৎদৃষ্টি নিয়ে স্বামীজীর আগে আর কেউ লেখনী ধারণ করেন নি। এ বিষয়ে 'উদ্বোধন' সম্পাদককে লেখা তাঁর বাংলাভাষাবিষয়ে পত্র এবং 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বিশ্বসভ্যতার পটভূমিতে লেখা প্রথম চলতিভাষায় মননসাহিত্য। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের স্থান তাঁর পরে। সাহিত্যের স্বাদগ্রহণে ও বিশ্লেষণে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত তাঁর অনেক লেখা ও মন্তব্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে উদ্বুদ্ধ করে।

শ্রীঅরবিন্দের রচনা ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সব গদ্য ও কবিতা-লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুজন নলিনীকান্ত গুপ্ত এবং দিলীপকুমার রায়ের চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গিমা বিশ্বসাহিত্যের অন্তপ্রেরণাসমৃদ্ধ মনন ও সমালোচনের নিদর্শন।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যপ্রসঙ্গে যে সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন বা কথায় কথায় আলোচনা করেছেন, রবীন্দ্রযুগের পরিমণ্ডলেও তার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয়তা প্রণিধানযোগ্য।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা তরুণতর সাম্প্রতিক লেখকদের কথায় আর যাবো না। কিছু কিছু কৃতী সমালোচনার নিদর্শন মিললেও সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য অনেকটাই গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদের পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতা। মননে, প্রকাশে সপক্ষ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে পূর্বসূরীদের কাছে একালের সমালোচকদের অনেক কিছুই শিক্ষণীয়।

সমালোচনাসাহিত্য সব সাহিত্যেরই বিবেক। আর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বই বিবেকের ধারণীশক্তি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মতো শ্রেষ্ঠ সমালোচনাও মহৎ শিল্প এবং মহত্তর জীবন-বোধের সমন্বয়। এ দিক থেকে এখনকার সমালোচনাসাহিত্যের মানদণ্ড কী, সে বিচারের ভার পাঠকমণ্ডলীর উপরেই থাক। সাহিত্যের সার্থকতাপ্রসঙ্গে একদা বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কাজ যা আছে, তাকেই আদর্শায়িত করা নয়; যা আদর্শ তাকে বাস্তবায়িত করা।' আদর্শ ও বাস্তবের এই টানাপোড়েন সবদেশের সমালোচনারই অন্যতম মূল সমস্যা।

'জ্যান্ত দুর্গা'

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

সপ্তশতী দুর্গাস্তুতি চিন্তি শত ভাবে—
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের বিচিত্র স্বভাবে,
জয়ন্তী মঙ্গলাকালী—আরও কতরূপে,
চামুণ্ডা-চণ্ডিকাদেবী-ব্রহ্মাণী- স্বরূপে,
নবদুর্গা, মহাকালী, মহালক্ষ্মী তথা—
আগম-পুরাণ-তন্ত্রে শুনি তব কথা।
তুমিই অম্ভৃণী বাক্ 'ত্বং স্বধা ত্বং স্বাহা'—
জগতের সবি তুমি যথা আছে যাহা।

যত পড়ি শাস্ত্রগ্রন্থ ধরিতে না পারি—
এক রূপ ছাড়ি মাগো! অন্যরূপ ধরি।
রূপে রূপে 'প্রতিরূপে' বিরাজিছ যদি
তবুও না পাই তোমা অনন্ত অনাদি।
(তাই) সর্বরূপ পরিহরি চিন্তি বারবার
'জ্যান্ত দুর্গা' মা সারদা! রূপটি তোমার।

আচার্য নন্দলাল ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়*

'সেই সময় ছাত্র যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ও অধ্যাপকেরা মিলে গুরুদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একমন একপ্রাণ হয়েছিলেন। সকলে আমরা এক আদর্শে গড়ে উঠেছিলুম। তখনকার কোন কাজ কর্তৃপক্ষের তাগিদে হ'ত না। নিজের ইচ্ছেতেই আমরা সবাই কাজ করতুম।

'গুরু-শিষ্যে সদ্ভাব ও সহানুভূতি, পরস্পরের সুখে দুঃখে সহযোগিতা, সেবা-শুশ্রূষা এ-সবই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বতঃসিদ্ধ ছিল। আন্তরিকতার গুণে সে একটা মহাশক্তি গড়ে উঠেছিল।

'আজ কেবলই মনে হয় কলাভবনে যাঁরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তখন ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে শিল্প বিষয়ে আলোচনা করে, এক জোটে কাজ করে, নানান স্থান থেকে আগত শিল্পী ও কারুশিল্পীদের সাহচর্যে আমরা কি আনন্দই না উপভোগ করেছি। এমন ভাবে মিলেমিশে এক জোটে কাজ করেছি বলে আজ বুঝে উঠতে পারছিনে কে কাকে কতটা শিখিয়েছি। গুরু-শিষ্য এক-সঙ্গে শিল্পচর্চা করেছিলুম বলে ছাত্রদের শেখানোতে আর নিজের শেখায় কোন বিঘ্ন বা পরিশ্রম হয়নি। শেখানো ও শেখাটা আগাগোড়াই ছিল একটা খেলার অঙ্গ। কে কাকে শিখিয়েছে, কখন কে শিখেছে, অনেক সময় আমরা টেরও পাইনি। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে থেকে গুরু-শিষ্য একসঙ্গে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিল্পশিক্ষায় যে রস পেয়েছি বাইরের কেউ তার খবর পাবেন না। সে আনন্দ লিখেও বোঝান যাবে না।'

ওপরের উদ্ধৃতিটি আচার্য নন্দলালের। আমার বিষয় আচার্য নন্দলাল ও তাঁর অনুগামী-বৃন্দের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত এবং সেই কারণে তাঁরই উক্তি দিয়ে তাঁর সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা।

নন্দলালের সৃষ্টি-জগৎ একটি পূর্ণ সাধনার জগৎ। সেখানে এমন কোন চিন্তা বা সৃষ্টি স্থান পায়নি যার মূল্য কেবলমাত্রই তাৎ-ক্ষণিক। সবসময় সর্বস্তরের সৃষ্টিতে কাজ করেছে চিরন্তন চেতনার একটি অধ্যাত্মসুর। রূপের মধ্যেই স্রষ্টাকে পেতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর শিল্পসাধনার চিন্তা ও ভাবনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ মানসিকতা কাজ করে-ছিল। সেগুলি হ'ল:

---

* প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। বিশ্বভারতী কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র। আচার্য নন্দলাল বসুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া চারুশিল্পের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। পরে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে শিল্পশিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সেখানে বহু ম্যুরাল ও অন্যান্য অলংকরণের সাহায্যে বিদ্যাপীঠের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলেন। ভাল শিক্ষক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

বর্তমানে তিনি কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের চারু ও কারু-কলা বিভাগের প্রধান এবং এই বিভাগটি ও তৎসংলগ্ন শিল্পসংগ্রহশালাটি তাঁহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অতি সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

বহু পত্রপত্রিকায় শিল্প ও নন্দলাল বসু সম্পর্কে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

পরম্পরা, সমাজবোধ, স্বদেশভাবনা, প্রকৃতি-পরিবেশ-চেতনা ও সর্বোপরি অধ্যাত্ম অনুভূতি। নন্দলালের চিত্র-চিন্তায় পরম্পরার স্থান বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে সারা জীবনের মধ্য দিয়ে। অতীতের ঐতিহ্যমাখা অমর শিল্পী-কুলের অসাধারণ সৃষ্টি দেখে বিস্ময়ে বলেছেন তিনি "আমরা 'পূর্ণ'।"

একথা আমরা সবাই জানি যে, বহমানতাই জীবনের ইঙ্গিত আর বদ্ধতাই মৃত্যু। তাই সেই সত্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যদি একবার পেছন ফিরে তাকাই তাহলে দেখব প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা থেমে নেই—আমরা পরম্পরার প্রবাহের মধ্য দিয়েই উচ্ছলভাবে বহে এসে দাঁড়িয়েছি আজকের আলোয়। দীপ থেকে দীপে প্রজ্বলিত হয়েছি।

সিংহনপুরের গুহা থেকে সুরগুজা, অজন্তা, বাঘ, রাজপুত, মোগল, অবনীন্দ্র—এমনসব কত বিচিত্র শৈলী-সম্পদে ধাপে ধাপে চলে এসেছি। ছন্দপতন কোথাও ঘটেনি। কেউ বলতে পারবে না অজন্তা চিত্রশৈলীর সামনে দাঁড়িয়ে যে এ সিংহনপুর বা সুরগুজারই পুনরাবৃত্তি। তবে একথা অনায়াসেই বলতে পারবে এরা একই জন্মসূত্রে গাঁথা। বহমানতা আমি তাকেই বলি নানান নামরূপে রূপান্বিত হয়েই যে একসত্যে উপনীত হচ্ছে। বহু রূপের মাঝেই তারা পরস্পরের মধ্যেই অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

নন্দলাল বিশ্বাস করতেন, এই বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ পরম্পরার বেদীমূলেই তাঁর জন্ম। ভারতীয় হয়েই তার বিশ্বপরিচয়ের ছাড়পত্র। এ প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন—আমি যদি আমার পূর্বপুরুষের শিল্পসৃষ্টির আদলে কিছু করে থাকি তাতে আমার লজ্জা নেই, কিন্তু সেই আদলের মধ্য দিয়ে যদি নিজের আদলের মোহরছাপ রেখে যেতে পারি তাহলেই সর্ব-কালের মানুষের কাছে, রসিকের কাছে আর দেশের মনের মণিকোঠায় আমার বেঁচে থাকা। আজও যেসব মহান স্রষ্টাদের আমরা স্মরণ করি, তা করি, তাঁদের সৃষ্ট সেই দুর্লভ আদলের বিশেষত্বের জন্য। একটি ছাপ রেখে যাওয়ার পেছনে অকৃত্রিম অনুরাগ, নিষ্ঠা, ধৈর্য আর চর্চার কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

বিশেষ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এলে দেখব—সব দেশেই শিল্পসৃষ্টির পেছনে একটি বিরাট আদর্শ কাজ করেছে এবং প্রত্যেকেই সেই মুক্তির আস্বাদই পেতে চেয়েছেন। এর জন্য নিত্য নোতুন প্রচেষ্টা দিনের পর দিন চলেছে। আদর্শের সুরটি এক কিন্তু পরিবেশ, পরিজন, চিন্তার ক্ষেত্রে বারবারই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। আজকের আলোয় বা বিচারে দেখলেও আমরা নিশ্চয়ই ভুল করব না যে, আলতামিরা গুহাচিত্রের সময় থেকে জত্তো, মাইকেল, লিওনার্দো ও আজকের ইউরোপীয় চিত্রচর্চার মধ্যে একটি জন্মবন্ধনের অস্তিত্ব বর্তমান। আর সেই বন্ধনের সঙ্গেই বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর বেঁচে থাকা।

আজকের চিত্রচিন্তার পরিচয়ে ব্যাপ্তির ক্ষেত্র না-মানার আকাঙ্ক্ষা উচ্চারিত। এ এক অভিনব চিন্তার উন্মেষ। অভিনব এই কারণেই যে, কোন পরিচয়চিহ্ন না নিয়েই বিশ্বের বলে পরিচিত হবার প্রয়াস কতটা সত্য জানি না, তবে এটুকু বুঝি, আমরা যারা আজ চলাফেরা করছি তারা এক পরম্পরার স্বাক্ষর বহন করেই চিহ্নিত। এ সত্যকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই নেই এবং তা সম্ভবও নয়। এত বিশাল ইউরোপ যার সভ্যতায় আমরা মুগ্ধ, তাদের মাঝেও গণ্ডীপরিচয়ের এক শ্রেষ্ঠতাবোধ খুব সক্রিয়ভাবেই বর্তমান। তাই

সেই বিশ্বাসে নন্দলাল নিজেই বলেছেন, পরম্পরা হচ্ছে আমাদের মূলধন, তার ওপর বসেই নোতুন ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে তুলতে হবে।

পরম্পরার বিষয়ে গুরু অবনীন্দ্রনাথের একটি উক্তি প্রায়শই উচ্চারিত হয়। তা হ'ল—'ট্র্যাডিশন হচ্ছে এঁটো পাতা।' আমার মনে হয় এ বলার পেছনে একটি চিন্তা কাজ করেছিল। তা হচ্ছে—থেমে যাওয়ার ভয় আর পুনরাবৃত্তি। কেননা আমরা যেন ভুলে না যাই সদ্‌গুরু হ্যাভেলের হাতে ধরা অতসী কাঁচের মধ্য দিয়েই দেশের ঐতিহ্য আর কষ্টহারিণীর ঘাটে বসেই স্বদেশবোধের অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর কাজের মধ্যে প্রথম যুগে এর আভাস স্পষ্টভাবে বর্তমান। তবে তিনি কোন দিনই পরম্পরার প্রতি দৃষ্টি দিতে বারণ করেছিলেন এমন নয়—তিনি তার মধ্য দিয়ে অতিক্রমের কথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন।

উপনিষদ্, পুরাণ, মহাকাব্যের নানান সুন্দর সুন্দর ঘটনা-চরিত্র পুনর্বার স্থান পেয়েছে পূর্ণ চিত্রমর্যাদায় নন্দলালের চিত্রপটে। অনেকে বলে থাকেন—পুরাতন ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে কোন রোমাঞ্চ নেই এবং নোতুনত্বও নেই। একথা যেমন সত্য বলে মনে হয়, তেমন এও সত্য বলে মনে হয় যে, সেইসব ঘটনা জীবনকে সত্যভাবে আজকের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তা একান্তই আজকের মনে হয়। আজকের মনে হয় এই কারণে যে, সেইসব সজীব ঘটনা আজকের বেঁচে থাকা মানুষকে পুলকে চঞ্চল করে বলেই। আধুনিক বলি সেই চিত্র, সেই কবিতা, সেই সৃষ্টি—যা বেঁচে থাকা মানুষের হৃদয়কে আনন্দরসে সিক্ত করতে পারে—কালের চিহ্নে সে যতই পুরাতন হোক। আর একটি সত্য যেন বিস্মৃত না হই, তা হ'ল—এইসব প্রাচীন গ্রন্থাদি কিন্তু পূর্বকালের মানুষের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতারই জ্ঞানভাণ্ডার। এসব মানুষকে ছেড়ে নয়। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'র গভীর আহ্বান আবহমান কালের প্রাণের কাছে। ঋষির মুখনিঃসৃত এ বাণী কিন্তু জ্ঞানলব্ধ অনুভূতিরই সত্যপ্রকাশ।

নন্দলাল সেই সব জ্ঞানলব্ধ অনুভূত ঘটনাকেই নোতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিল্পীর শিব বিষয়ক চিত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। শিবচরিত্র ও রূপের এমন সুন্দর মোহময় অথচ নিরাসক্ত গভীর চরিত্ররূপ চিত্রপটে বুঝি এর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রাচীন রাজপুত চিত্রমালায় সুখী শিবসংসারের মধ্যে এদের দেখেছি কিন্তু হলাহল পানরত অচঞ্চল বিকারবিহীন সমাহিত শিবরূপে দর্শন এই প্রথম। নীলকণ্ঠ এখানে পরহিতকামী—নিষ্কাম স্বার্থত্যাগের একটি পূর্ণ প্রতীক। (চিত্র দেখুন)।

আর একটি চিত্ররূপের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখব—উমার সন্তানসন্ততি নিয়ে মায়ের ঘরে আসবার ক্ষণটি। চিত্রপটে কোথাও অস্বাভাবিকতার স্পর্শ নেই, এ যেন নিত্য বর্ষের ঘটনা—মেয়ের বাপের বাড়ী আসার এই সুখকর চিত্রই সবার হৃদয়ে গাঁথা। এই ভাবে সতীর দেহত্যাগ, তাণ্ডবনৃত্য—এমন সব অসংখ্য উপাখ্যান স্থান পেয়েছে নোতুনভাবে নন্দলালের চিত্রপটে। এর মধ্যে একটি বিশেষ চিত্রের উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

আমরা অনেক সময় চিত্রে হাওয়া, শব্দ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কথা জেনেছি—নন্দলাল তাঁর শিব উমা আর নন্দী চিত্রে আমাদের

কথা বলার অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছেন। কী অসাধারণ পরিকল্পনা। উমা চলেছেন শিব-বন্দনায় আর এই অভিসারছন্দের পাহারায় রত নন্দী মুখে একটি আঙুল দিয়ে শব্দ করতে বারণ করছে—পাছে সামান্যতম শব্দতরঙ্গে এই ভাবময় অনুভূতির পরিবেশ ব্যাহত হয়। এমন ভাবেই শিল্পী তাঁর হৃদয় দিয়ে প্রাচীন ঘটনার চিত্ররূপ দিয়েছেন। একই সময়ে এমন অপরূপ অনুভূতিশীল চিত্রসৃষ্টির ঘটনা দুর্লভ।

পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সম্বন্ধে নন্দলাল একটি বিশেষ কথা বলতেন। তা হ'ল সমাজের প্রতি শিল্পীর অবশ্য কর্তব্য আছে। শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সমাজের অপরজনের উত্তরণ ও সঙ্গী করার দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না। তিনি গভীরভাবে একথা অনুভব করতেন বলেই তাঁর চিত্রপটে সমাজের প্রতিটি মানুষ আত্মমর্যাদায় পূর্ণ রূপে স্থান করে নিয়েছে। মানুষের নিত্য দিনের নানান ঘটনা কখনই তাঁর চোখ থেকে বাদ যায় নি। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি জীব তাঁর কাছে সমান মর্যাদায় চিহ্নিত। এ প্রসঙ্গে মাতৃভাবে আঁকা 'মা' চিত্রটি একান্ত দর্শনীয়। নানান জীবজন্তুর মধ্য দিয়ে স্তন্যদানরতা মায়ের ও সন্তানের অপরূপ প্যানেলটি রচনা করেছেন এবং এই ছবির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সর্বজনীন চিত্রভাবনার কথা। কথাপ্রসঙ্গে একদিন জিজ্ঞাসা করে-ছিলুম, চিত্রে 'সর্বজনীন' ভাবনাটি কত সত্য? একটি অপরূপ উত্তর দিয়েছিলেন সে সময়ে, যা আজও আমার মনকে পল্লবিত করে আনন্দে। তিনি বলেছিলেন, শিল্পে সর্বজনীনতা হচ্ছে ভাবে—রূপে নয়। এর পূর্ণ প্রমাণ পাই উল্লিখিত চিত্র-প্যানেলে।

বাৎসল্যরসের এমন উপমার মধ্য দিয়েই রূপের ভিন্নতা আর ভাবের একীকরণের পূর্ণ প্রমাণ।

তিনি কেবলই বলেছেন শিল্প কেবলমাত্র একার জন্য নয়—এর বিস্তার ও প্রকাশ সবার জন্য। সবাই আর্টিস্ট হবে না, কিন্তু দেখার দৃষ্টি দিয়ে সে শিল্পীর পূর্ণতা পাবে অর্থাৎ রসিক হবে। সমাজের নানান জীবিকার শিল্পীদের কাছেই তিনি ঘুরে ফিরেছেন, শুধু তাই নয় এইসব কারিগরদের সসম্মানে এনে বসিয়েছেন গুরুর আসনে। জয়পুরী ভিত্তিচিত্র শেখার সময় যে শিল্পীকে এনে কলাভবনে রেখেছিলেন তিনি নন্দলালকে ছাত্র ছাড়া জানতেন না এবং এবিষয়ে নন্দলাল তাঁর ছাত্রদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেছিলেন বলতে, কেননা কলা-ভবনের পরিচালক হিসাবে জানতে পারলে জয়পুরের শিল্পীর মনোভাবে পরিবর্তন আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু সবচেয়ে মধুর ঘটনা ঘটল শিল্পীকে কার্যশেষে ছাত্ররা বিদায় জানাবার মুহূর্তে—গুরুশিল্পীর দুচোখ বেয়ে জল পড়ে চলেছে কেননা তিনি শেষ মুহূর্তেই জানতে পেরেছেন যাঁকে ধমক দিয়ে কাজ করিয়েছেন এতদিন, তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। এ ঘটনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, যে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি এসব কারিগরদের কাছে যেতেন, তার পরি-প্রেক্ষিতটি তুলে ধরা।

নন্দলাল বিশ্বাস করতেন আধুনিক জীবন-যাত্রা যেমন বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অভিনন্দিত, তেমন দেশের কারুশিল্পের নবপর্যায়ে চিন্তার উন্মেষ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এবং এই প্রয়োজনের কথা ভেবেই কলাভবনে চারু ও কারুশিল্পের একীকরণ। কারুশিল্পের মধ্য দিয়ে সঞ্জীবিত হয়ে আছে ভারতশিল্পের চেতনা।

ভারতশিল্পের অমরত্ব কেবলমাত্র গুহা-

শিবের বিষ-পান
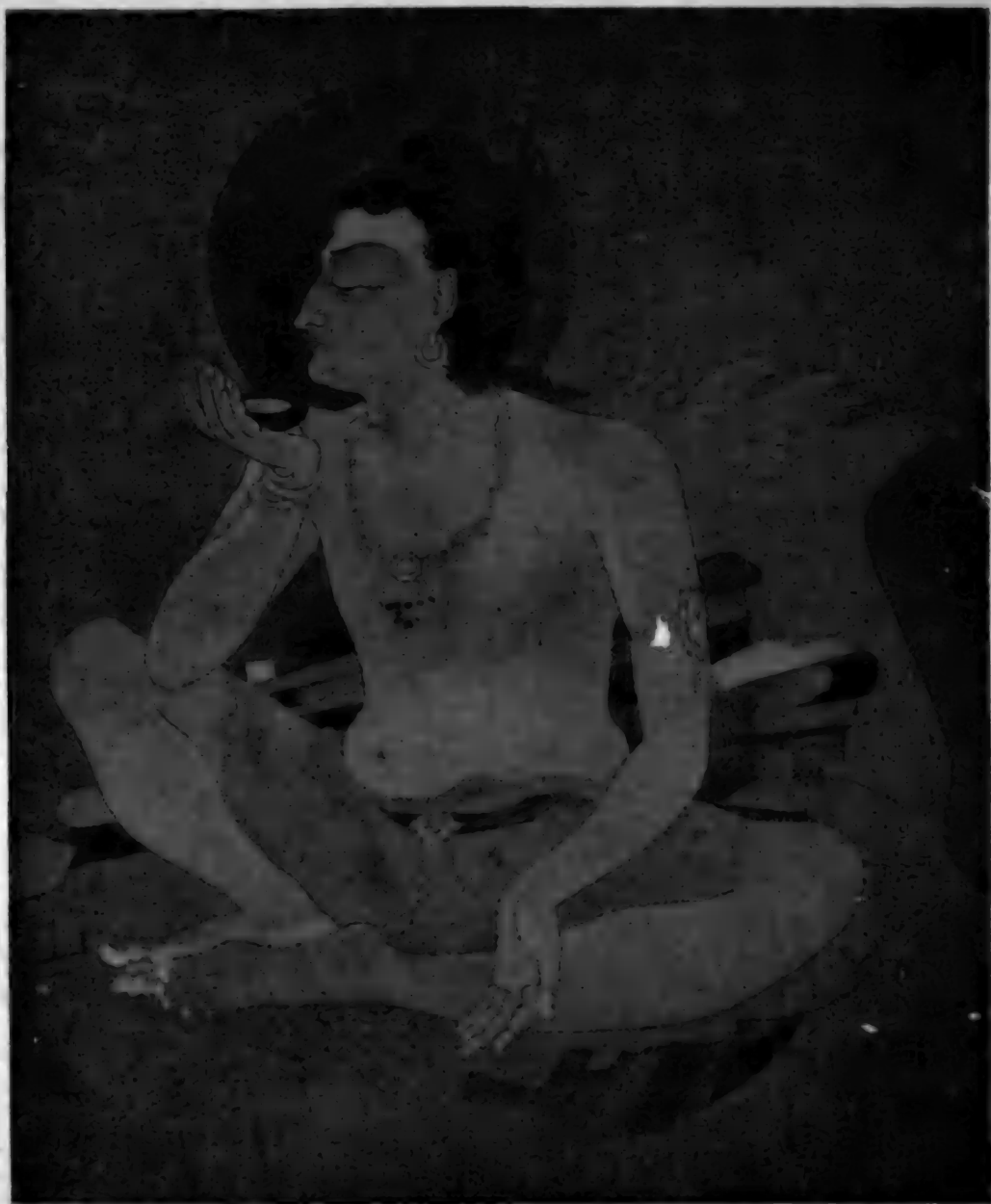
শ্রেণীর চিত্রমালার মধ্যেই নয়। এর অমন্বয় প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য ব্যবহার্য শিল্প-সামগ্রীর মধ্যে, নানান পালাপার্বণের মধ্যে। জীবনের সঙ্গে সমন্বয় ঘটেছে বলেই আজও আমরা শিল্পের এমন সমারোহে পূর্ণ। সর্ব-দেশের শিল্পজীবনের মধ্য দিয়ে এলে দেখব, যে কোন মহৎ সৃষ্টি কখনই সমাজকে অগ্রাহ্য করে নয়। কেননা এ সত্য ভুলে গেলে চলবে না যে, সৃষ্টি-ঐশ্বর্য সমাজের কল্যাণেই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, যে চিন্তা সমাজের মধ্য দিয়ে নন্দলাল করতে চেয়েছিলেন আজ তা অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে। আমাদের জীবনে সঠিক চিন্তী-করণটি বার-বারই দেখিতে ঘটেছে। পনের শতকের রাজপুত শৈলীকে জানতে বিংশশতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে—অজন্তা ও অন্যান্য চিত্রশৈলীকে গ্রহণ করতেও আমরা অনেক সময় নিয়েছি ও নিচ্ছি।

এই পরম্পরা ও সমাজবোধের মাঝ দিয়েই নন্দলালের স্বদেশভাবনার পূর্ণতা। স্বদেশ-ভাবনা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন : পরাধী-নতার কি অসহনীয় জ্বালা তা তোমরা অনুভব করতে পারবে না—পারবে না অনুভব করতে আমারই মাটিতে আমায় অস্বীকার করার ঔদ্ধত্যকে। অনেকাংশে এই পরাধীনতার বন্ধনই নিজের দেশের শিল্পের প্রতি নন্দ-লালকে এত আগ্রহী, এত একাত্ম করে তুলেছিল। এই স্বদেশচিন্তার মধ্য দিয়ে রূপান্বিত তাঁর অসংখ্য ছবির কথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু অনেকেই জানি না অনেক অনেক ছবির কথা, যা আজ হারিয়ে গেছে—যেমন কলাভবনের মধ্যে গড়ে-ওঠা অভিনব ছাপাখানায় ছাপা বড় বড় প্রাচীর-চিত্রের কথা। কেবলমাত্র তাদের কিছু নাম আমাদের মনে আছে ; যেমন,— কুইট ইণ্ডিয়া, কস্টার মাদার ইত্যাদি। তবে একটি ছোট দিনলিপির কথা জানি যাতে বিষয়বস্তু একটি গাভী ও দুগ্ধপানরত বৎস। চিত্রটির দিকে বিশেষ-ভাবে তাকালে দেখব সারা গাভীটির প্রান্তরেখা মিলে সারা ভারতের প্রতিচ্ছবি এবং দুগ্ধপানরত বৎসটির প্রান্তরেখা ইংলণ্ডের। তিনি দেশমাতৃকার মুক্তি-আন্দোলনে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারেন নি। অবশ্যই তাঁর হাতিয়ার ছিল—ভালবাসা, সাহস, তুলি আর বর্ণ। কত সামান্য জিনিস দিয়ে কি অসামান্য মঞ্চসজ্জা হতে পারে, কত সুন্দর নগরী গড়ে উঠতে পারে সে কথার পুনরাবৃত্তি এখানে নয় —তাঁর বিচিত্র পথসন্ধান এবং লক্ষ্যে পৌঁছনর পিছনে এক বিশেষ বিপ্লবী মনোভাব কাজ করত। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক জায়গায় বলেছেন 'আত্মবিদ্রোহী শিল্পী'—একই উপকরণে সন্তুষ্ট নন—প্রতিনিয়তই খুঁজে ফিরেছেন তন্ন তন্ন করে। এ উক্তির প্রমাণ আমরা সত্যিসত্যি পাই নন্দলালের সারা জীবনে। ১৯৪২এ আঁকা মহিষমর্দিনীর চিত্রটি লক্ষণীয়। পরাজিত অসুরের মাথায় ইংরেজ রাজমুকুট আর মায়ের হাতে ধরা কপিধ্বজটি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত—পেছনে আন্দোলনের লেলি-হান অগ্নিশিখা—এখানে শ্রীশ্রীদুর্গার মধ্য দিয়ে মাতৃশক্তির জাগরণ ও অপসুর নিধনের বক্তব্যই স্পষ্ট। এমনভাবে নানান চিত্রচিন্তার মধ্যে ভারত-নন্দলালকে পাওয়া যাবেই।

পরম্পরা ও স্বদেশবোধই নন্দলালকে দেশজ উপকরণের প্রতি এত আসক্তি এনে উৎসাহিত ও আগ্রহী করে তুলেছিল। এছাড়া যুগ যুগ ধরে এর উজ্জ্বল থাকরও শিল্পীর মনে সাহস ও ব্যবহারিক স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত

করেছিল। কিন্তু এই চর্চার মধ্যে যে ভাবটি তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় কাজ করেছিল তা হচ্ছে: পরমুখাপেক্ষী হয়ে না থাকা—নিজের প্রয়োজনের সামগ্রী নিজেই তৈরী করে নেওয়া।

অনেক ক্ষেত্রে শোনা গেছে যে তিনি বিদেশী শিল্পকরণ-কৌশল আয়ত্তের বিরোধী ছিলেন। একথা যথাযথ নয়। কেননা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: আমাদের দেশে ইউরোপীয় প্রথাচিত্রের করণ-কৌশলের শিক্ষকের অভাব। সেই কারণে বিশেষ রীতির করণ-কৌশল ও উপকরণ-ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রের সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে না। প্রত্যেক মাধ্যমের একটি বিশেষ অনুশীলনের দিক আছে। আমি মনে করি আমাদের সময়ে সে ধরনের শিক্ষকের অভাব ছিলই। এছাড়া নিজস্ব রীতিতে আমি কাজ করেছি বলেই অন্য কাউকে সে বিষয়ে বলতে বাধ্য করতে পারি না।

আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনের কলা-ভবন শিক্ষাকেন্দ্রের মূল আদর্শই ছিল ভিন্ন—দেশজ ভাবনা, দেশজ রীতির একটি বিশেষ ধরন ও গড়ন গড়ে তোলার প্রবণতাই একমুখী চিন্তার মুক্তি। এই বিশেষ রীতি-আনুগত্যের পেছনে 'উদার মনোভাবে'র অভাবের কথা প্রায়শই শোনা যায়। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে, ইউরোপীয় কোন শিল্পী এদেশের প্রকরণের ও চর্চার প্রতি আকৃষ্ট না হয়েও উদার থেকেই যাচ্ছেন—পিকাসোর স্বদেশ-ভালবাসার মধ্য দিয়েই গুয়েরনিকার জন্মের কথা আমরা ভেবে দেখতে চাই না। নিজের দেশের প্রতি ভালবাসার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অহরহই আমাদের সামনে দৃশ্যমান। তবু আমরা দেশজ চিন্তায় ঘরকুনোর আখ্যা কুড়িয়েই যাচ্ছি।

দেশের মাটি থেকে উপকরণ আহরণ ও তার সংক্ষিপ্ত সুন্দর ব্যবহার নন্দলালচিত্রের একটি বড় সম্পদ। নন্দলালের সাধকজীবন ও প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। দুই সত্তার একীকরণই তাঁর শিল্প-চেতনার চাবিকাঠি।

প্রকৃতি-পরিবেশ নন্দলালের চিত্রজীবনে একটি প্রধান অধ্যায়—ভারতশিল্প-পরম্পরায় একটি বিশেষ অধ্যায়ের সংযোজন। নন্দলালই প্রথম শিল্পী, যিনি প্রকৃতিকে এমনভাবে একক সম্মানে চিত্রপটের আসনে বসবার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকৃতি ভারতশিল্পে বার বার চিহ্নিত হয়েছে কিছু বক্তব্যের সমাধানের জন্য। একটি ফুল, একটা গাছ বা একটি তৃণ কিংবা এক গুচ্ছ ফুলের ডালে বসে-থাকা এক ঝাঁক পাখির মিলে-যাওয়া রূপটি নন্দলালের চিত্রপটে নোতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃতি বলতে কেবলই গাছ, কেবলই পাহাড়-পর্বত নয়, সাধারণ মানুষ, জীব-জন্তু সবই প্রকৃতির বেষ্টনীতে।

এই সজীব চঞ্চল প্রকৃতিই তাঁকে ছন্দের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে। নানান ছন্দের প্রাণবন্ত নানান রূপ অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরে দিয়েছে নন্দলালের সারা জীবন। অভ্রভেদী হিমালয়ের শান্ত যোগমূর্তি থেকে শুরু করে নীচে-বয়ে-যাওয়া পদ্মার বুকে উড়ে-যাওয়া শ্বেত বলাকার অপরূপ ছন্দদোলায় কোনটিই বাদ যায় নি।

প্রকৃতির এই সাবলীল ছন্দোময় গতিই নন্দলালের তুলির বলিষ্ঠতা এনে দিয়েছে। বর্ণ, তুলি আর ছন্দের সমন্বয়ে গুজরাটী নৃত্যের সঙ্গে 'নটীর পূজা'র আত্মনিবেদনের কিংবা শারদ লক্ষীর শান্তশ্রী অনুপম ছন্দমাধুরীর মধ্যে

পার্থক্য যেমন অসাধারণ তেমনি আত্ম-সম্পর্কটিও দর্শনীয়। এমন বিচিত্র গতি, ক্ষুরধার ক্যালিগ্রাফিক গুণ ও দক্ষতা ইদানীংকালের কোন শিল্পীর চিত্রচরিত্রে সচরাচর ধরা পড়েনি। এই ছন্দবিচিত্রতাই নন্দলালকে একটি বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছাত্র রমেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির একটি ছত্রই বোধ করি গোটা ছন্দের মানুষটিকে চিনিয়ে দেবে—তা হ'ল: 'আমি সাপ খেলাবার ঝুড়ি নিয়ে বসেছি।'

প্রকৃতি যেমন নন্দলালকে ছন্দবন্ধনের মধ্য দিয়েই মুক্তি দিয়েছে, তেমনি শিল্পীর অধ্যাত্ম-চিন্তাপূর্ণ জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছে। অধ্যাত্ম-চিন্তা বলতে আমি বলতে চাইছি—সর্বস্তরে, সর্বজীবনে নন্দলাল সেই পরমের স্পর্শই অনুভব করেছেন এবং সেই অনুভূতিতেই বলেছেন—পরমের প্রকাশ কেবলমাত্র দেব-দেবীর চিত্রচিত্রণের মধ্যেই আছে, তা নয়, একটি ঘাসের ওপর একবিন্দু শিশিরের কোলেও তা বিরাজমান।

অবশ্যই নন্দলালের এই অনুভূতির তারতম্যের বোধোদয় শান্তিনিকেতনের সাধনক্ষেত্রেই। এক্ষেত্রে নন্দলালকে আমরা অনায়াসেই দু-অধ্যায়ে ভাগ করে ফেলতে পারি—প্রথম কলকাতায় শিল্পশিক্ষার্থীজীবন, দ্বিতীয় তাঁর বিরাট স্বাধীন ও মুক্ত শিল্পজীবন শান্তিনিকেতনে। এই দুই অধ্যায় মিলেই পূর্ণ শিক্ষার্থী নন্দলাল।

অধ্যাত্ম অনুভূতির তীব্রতার প্রকাশে নিজেই বলেছেন—নিত্য নিয়মিত সাধনার ফলে—অবশেষে মনটি হবে পূর্ণ কলসের মত। কোন কারণে এই পূর্ণ মন-কলসটির একটু নাড়াতেই অক্ষয় রসানুভূতি, রূপানুভূতি ছলকে পড়ে হবে—ছবি, মূর্তি, গান, কবিতা আর নৃত্য। আত্মাকে মানতে পারলেই এর পরিপূর্ণতা।

পূর্বদিকের সবুজ বনের মাথায়, কাজলা কালো মেঘ, আমার এত ভালো লাগছে কেন? মনকে এমন নাড়া দিচ্ছে কেন? কারণ আর কিছু নয়, একই সত্তার, একই চেতনার, এক প্রান্ত হ'ল ঐ মেঘ আর অন্য প্রান্ত হ'ল এই আমি। একদিকে মেঘ, আর একদিকে আমি, তাই মেঘের সুখ আমাতে অথবা আমার দুঃখ মেঘে সঞ্চারিত হচ্ছে। একই সত্তা বিষয় ও বিষয়ী। একই চেতনায় নানান রকম দোলা লাগছে, ঢেউ লাগছে।

এমন ভাবেই অধ্যাত্ম অনুসারী চেতনার মধ্য দিয়েই শিল্পীর সমগ্র চিত্ররাজীর জন্ম। এইসব চিত্রচিত্রণে যেমন নিজের অন্তরের অনুভূতি কাজ করেছে, তেমন বুঝতে চেয়েছেন ঈশ্বরদর্শীর হৃদয়ের মধ্য দিয়ে—বিবেকানন্দের পার্থসারথির চরিত্রচিত্রণ শিল্পীকে এই চরিত্র-সৃষ্টিতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। এমন ভাবেই উদ্বোধিত হয়েছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, গুরু অবনীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে।

নন্দলালের সারা জীবনের স্বকীয়তা তাঁর প্রতিদিনের রোজনামচায় এক-একটি চিত্রচিত্রণে বিধৃত। এমন রোজনামচা নিত্য মন্ত্র-উচ্চারণের মত কেউ করে গেছেন কিনা সন্দেহ। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক শিল্পীর কাজের গণিত-সংখ্যায় বিস্মিত হই। নন্দলালের সৃষ্টি সম্বন্ধে তেমন জিজ্ঞাসা আজও উপস্থিত হয়নি বোধকরি—তবে এ জিজ্ঞাসার সন্ধান কত বিস্ময় এনে উপস্থিত করবে তা সহজেই অনুমেয়।

নন্দলালের স্বকীয়তা বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে না নিশ্চয়ই। একই সত্তা ও বেষ্টনীর মধ্যে বসবাস করেছে সৃষ্টি, স্রষ্টা ও তাঁর ব্যক্তি-জীবন—এই তিনের সমন্বয়ের মধ্যেই

পূর্ণ নন্দলাল আর তাঁর স্বকীয়তার প্রকাশ।

বাস্তবকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে ঘুরে-ফিরেই তা নিজের আদলে অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাইতো যা দেখেছি তাই নয়—যা মনকে নাড়া দিয়ে ভাল লাগিয়েছে তারই প্রকাশ। তাঁর কথাতেই বলি—তুমি যে আজ বৃক্ষের আরাধনা করছ, ছবি আঁকছ, যদি সত্যি একে ভালো লেগে যায় এ তোমার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাচ্ছে। জীবনে কোনদিন হয়ত অশেষ দুঃখ পাবে। প্রিয়জনকে হারাতে হবে, সংসার শূন্য মনে হবে, তখন পথের ধারে এই গাছ বলবে, এই যে আমি আছি, তুমি সান্ত্বনা পাবে। এ তোমার অক্ষয় সঞ্চয়, এ জীবনের নয় জীবনান্তরেরও।

এই প্রসঙ্গে একটি জিজ্ঞাসা: একটি বেদনাহত বা আনন্দবিহ্বল হৃদয় যেমন তার বেদনা, দুঃখ বা আনন্দ জানাবার একটি ঠাঁই খোঁজে, দেবতার মন্দিরে, প্রকৃতির কোলে, গানে বা কবিতায়, ছবির ক্ষেত্রে এমন সৃষ্টির কথা কি ভাবছি যা আমাদের বেদনার উপশম বা আনন্দের অংশীদার হতে পারে?

নন্দলালের বিচিত্র সাধন ও চিত্রজীবনের সমীক্ষা এখানে নয়। এখানে চেষ্টা করেছি তাঁর চিত্রসৃষ্টির মূলে যে অনুপ্রেরণা, যে শক্তি কাজ করেছিল তারই সামান্য আলোচনা করতে। আর সেই শক্তিমন্ত্রেই যাঁরা দীক্ষিত, তাঁদেরই আমি বলি নন্দ-অনুগামী শিল্পীবৃন্দ। অনুগমন নন্দ-পুনরাবৃত্তিতে নয় নন্দানুগমনে, নন্দ-উত্তরণে। এই চরৈবেতি শক্তিতে বিশ্বাসী হয়েই নন্দলাল তাঁর অনুগামীদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাই একই আসনে বসে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন এবং সেই কারণেই প্রত্যেক অনুগামী তথা ছাত্র বিশিষ্টভাবে নিজের ভঙ্গী ও প্রকাশে আলাদা চিহ্নিত আসন গড়ে নিতে পেরেছেন।

নন্দলালের শিক্ষাজীবন তাঁর ছাত্র অনুগামীদের ত্যাগ করে কখনই ছিল না। সারাক্ষণ ছাত্রপরিজনের মাঝেই তাঁর বসবাস। যা দেখে, যা ভাল লেগে অভিভূত হয়েছেন তাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারায় নন্দলালের নিঃসঙ্গ নয়—সনন্দন অবগাহন।

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে অবাক লাগে যে, নন্দলাল সারা জীবনে নিজের উদ্যমে প্রচারের জন্য কোন প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করলেন না। যখনই কোন প্রদর্শনীর কক্ষ-শালায় যাবার উদ্যোগ করেছেন তখনই সঙ্গে ছাত্র ও অনুগামীদের কিছু কাজ সঙ্গে থেকেছে—তাদের ছবি প্রদর্শিত হলেই আত্মসন্তোষ—এমন ঘটনা সারাজীবন ধরেই ঘটেছে তাঁর জীবনে। এই নিরাসক্ত প্রচারবিমুখ প্রবণতা তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে বিশেষভাবে। তাঁর অনুগামীদের ভেতর আজও এমন শিল্পীসাধক আছেন যাঁরা নীরবে কলালক্ষ্মীর পূজা করে চলেছেন, বলতে পারছেন—এই ছবির মধ্য দিয়েই আমার পরম পাওয়া। যাঁরা পাদপ্রদীপের তলায় এসেছেন তাঁরা ছাড়াও অনেক শিল্পী তাঁদের অমূল্য চিত্রসম্পদ নিয়ে নীরবেই থেকে গেছেন। আমরা অনেকেই জানি না যে অন্নদা মজুমদার নামে এক নীরব শিল্পী কী অসাধারণ কাজ রেখে গেছেন—যাঁকে হাতে ধরে অবনীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে এনে নন্দলালের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

নন্দলালের অর্ধেন্দুর মোহময় কাজ আমরা দেখতে পাই না, পাই না—সুলতান হরা-হাপের কাজ বা হীরাচাঁদ দুগারের সূক্ষ্মরেখা ও বর্ণ। শিল্পের প্রতি নির্লোভ নিষ্ঠাই নন্দ-

লালের ছাত্রহৃদয়ে অধিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠা। তাঁর শিক্ষাগুণের সবচেয়ে বড় দিক ছিল প্রতিটি ছাত্রের গ্রহণ ও বর্জন-ক্ষমতার মাঝ দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করা। এই শিক্ষার মধ্যেই সবার কাজ একসঙ্গে সাজিয়ে রাখলেও প্রত্যেকেই একসূত্রে গাঁথা হয়েও ভিন্নতায় সম্পূর্ণ।

কলাভবনের এই সাধনচত্বর থেকেই নন্দলাল সারা ভারতবর্ষে ছাত্র ছড়িয়ে গোটা শান্তিনিকেতনের মূল শিল্পচিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'রসো বৈ সঃ'-অনুভূতির সার্থক সাধক নন্দলালের সবচেয়ে বিচিত্র চালচিত্র হচ্ছে তাঁর অসংখ্য অনুগামী ছাত্রকুল আর তাঁর গুণমুগ্ধ রসজ্ঞ রসিকদল।

বর্তমানে গ্রাফিক শিল্পের যে চঞ্চলতা সারা দেশের শিল্পচর্চার মধ্যে বিশেষ স্থান পেয়েছে তার প্রথম যুগের শিল্পীদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ অবশ্যই স্মরণীয়। এছাড়া ভাস্কর্যশিল্পের মধ্য দিয়ে যে নব চেতনার উন্মেষ তাতে রামকিঙ্করের অবদানের কথা ভুললে চলবে না। এমন ভাবেই বিচিত্র বিষয়ে বিচিত্র ধরনে নন্দ-অনুগামীরা সারা শিল্প-জগৎকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নন্দলালের ছাত্রদের গুণপনা ও সৃষ্টির বিচারেই এ আলোচনার সমাপ্তি নয়—তিনি যে প্রেরণার আদর্শটিকে সঞ্চারিত করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা হ'ল ছবিকে নিজের ভাষা এবং বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে স্বকীয়তার সৃষ্টি। সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই রামকিঙ্করের করা শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাড়ীর সামনের বিমূর্ত শিল্পসম্পদটি আজও চিরঞ্জীব। কেননা আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে নন্দলালের ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য শান্তিনিকেতনের জীবনে অনেকখানি ছিল। রামকিঙ্করের কথাতেই বলি—'তিনি আমার ছবির সমালোচকদের কাছে আমার defend করার চেষ্টা করতেন। তার নিদর্শন শান্তিনিকেতন মন্দিরের কাছে মূর্তিটি। আমার আচার্যদেব ছিলেন বিশ্বকর্মার বরপুত্র। তাঁর কাজের ভিতর সত্য ও সুন্দর প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমরা পরম ধন্য হয়েছি।' তাঁর অনুগামীদের কাছে এমন সব কত অনুভূতির কথা জেনেছি। এক জায়গায় শ্রদ্ধেয় শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ বলছেন —'তাঁর মত গুরু পেয়ে আমরা ধন্য, তিনি কেবল গুরুই ছিলেন না, তিনি জীবনে চিরসাথী, চিরবন্ধু—তাঁর আদর্শ প্রেরণার মধ্য দিয়েই পরম জীবনের ছোঁয়া পেয়েছি।' এই সব কথার মাঝে আমরা স্পষ্ট ধরে নিতে পারি যে নন্দলাল ও তাঁর অনুগামী শিল্পীকুল একই ভাবনায় ভাবিত ছিলেন।

গুরু বলতে যে ধারণা আমরা ভারতীয় আদর্শে পোষণ করি নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রদের জীবন সেই অর্থেই প্রতিষ্ঠিত। গুরু কেবল বিদ্যাচর্চায় নয়, গুরু সকল চর্চারই মূলে রয়েছেন।

এমন ভাবেই নানান উক্তি ও ঘটনার মাধ্যমে আমরা নানান ভাবে জানতে পারি নন্দলালের ভারতশিল্প এবং তাঁর অনুগামী শিল্পীকুলের কথা।

নন্দলাল সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণ না করে পারছি না এবং কেবল নন্দলালের ক্ষেত্রে এ উক্তি হ'লেও সমগ্র শিল্পীসমাজের এই বক্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি—

'যে নদীতে স্রোত অল্প, সে জড়ো করে তোলে শৈবালদামের ব্যূহ, তার সামনের

পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা করে তোলে। তাদের কর্মের প্রশংসাযোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না, এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারই নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের চুরি চলে।

'আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমাবন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। আপনার মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত। সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ।'

আমার এই আলোচনার মাঝে আলাদা আলাদা ভাবে অনুগামীদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হ'ল না। কিন্তু কি আদর্শে গুরু-শিষ্য-মণ্ডলী অনুপ্রাণিত ছিলেন তার আভাস দিতে চেষ্টা করেছি। এই বেষ্টনীকে কেন্দ্র করে আছে অজস্র ভালবাসার, আনন্দের, সুখের ও নিরানন্দের সাথী হওয়ার অসংখ্য ঘটনা। তবে এই আলোচনার মাঝে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে নন্দলাল তাঁর শিক্ষায় কেবল শিল্পকেই যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাই নয়, এই শুদ্ধ সুকুমার চর্চার মধ্য দিয়ে পরম আনন্দের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিতই বার বার তিনি দিয়েছেন।

এই আলোচনা কেবলই জানা বা সংগ্রহ করা কথা নয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর শেষ জীবনের সমস্ত সময়টুকু কাটাবার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান হয়েছিলুম বলেই বুঝতে চেষ্টা করে জেনেছিলুম তিনি কেবলই ছবি আঁকেন নি—এই চর্চা আর সাধনার পথ ধরে মানবজীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সেই পরমের স্পর্শই পেতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-সন্দর্শন : বৈচিত্র্য বিরোধ ও উত্তরণ

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী*

বৈচিত্র্যবাহী ক্রমোত্তরণে যে বিশিষ্টতা রবীন্দ্রজীবন-সাধনায় সেখানে অ-চল এককে বরণ করে থেমে যাওয়া সম্ভব নয়,—সর্বেন্দ্রিয় রুদ্ধ করে যোগসাধনাও নয়[১],—অবিরাম বহিঃপ্রকাশের তথা আত্মপ্রকাশের দাবী অজ্ঞন করাটা রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-বিরুদ্ধ। এক, নয়তো বহু,—কিন্তু বহুর দিকে আকৃষ্ট হলেই আর দুইয়ে এসে থামার উপায় নেই—বহুবাহু-জীবনের ক্রমাগত আকর্ষণে অগ্রসরতা চলতেই থাকবে। এমনটা তো রবীন্দ্রনাথেরই কথা।[২] রবীন্দ্রনাথ স্ব-ভাবে তাই বহু-বিচিত্রেরই প্রকাশ-শিল্পী,—অনন্যদৃষ্টি একমুখী সাধক নন, বরং বহুবল্লভানুরাগী।[২] তিনি তাই কবি, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক,

---

* বর্তমানে কলিকাতা সিটি কলেজে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক; শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রকালীন প্রাক্তন ছাত্র; সাহিত্য-গবেষক, অনুবাদক ও গ্রন্থকার। সাম্প্রতিক গ্রন্থ : সাহিত্যশ্রী [অলঙ্কার ও ছন্দ]; সেক্সপীয়ার সাহিত্যসম্ভার [কিশোর সংস্করণ]; কাছেই জানালা [কাব্য], শান্তি ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রচক্রান্ত [অনুবাদ]।

সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রকর ইত্যাদি—এবং শিক্ষা-শাস্ত্রী, ধর্মসাধক, স্বদেশপ্রেমিক, বিশ্বমৈত্রী-সাধক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসব তো উদ্দেশ্যহীনভাবে বা লক্ষ্যহারা হয়ে সত্তাকে অবিরাম খণ্ডিতকরণ (Perpetual fragmentation of self)[৩] নয়, ধরাবাঁধা দায়দায়িত্ব এড়ানো নয়, বা বহু-রূপিত্ব দেখানো বহুরূপীর আকর্ষণী সজ্জাও নয়,—বরং এ তো নিজেকেই বহুরূপে দেখা ও জানা—এ তো আত্মবোধেরই প্রকাশ। এ তো অন্তহীন অভিপ্রকাশের কল্পিত-আলোকে অন্তহীন একেরই মহা-সন্ধান। একটিমাত্র লক্ষ্যলাভের উদ্দেশ্যে অনিবার্যরূপে একমাত্র পন্থাবলম্বনে যে অনমনীয় সততা ও সুস্পষ্ট কার্যকারিতা তা এখানে থাকে না, এবং থাকে না বলেই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শক্তি ও প্রতিভা অনুগামী আশানুরূপ প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শনে অপারগ হতে হয়েছেও বা, এবং ভুলভাবে ব্যাখ্যাতও হয়েছে তাঁর কার্যক্রমের ও সেইসঙ্গে ভাবপ্রকাশের ক্রমবাহিতা-বর্জিত অসংলগ্নতা—ভাব থেকে ভাবান্তর যাত্রায় পরিকল্পনাবর্জন বা অর্ধসমাপ্তি[৩], বা দোদুল্যমান অবস্থা[৩]—অবিরাম পথ-পালটানো, হাল-ফেরানো, পাল টাঙানো-নামানো। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনাভিসারের স্বকীয়তাই তো ঐ ক্রমোচ্ছ্বসিত জীবন বাণী ও কর্মরূপের সঙ্গম রচনা—সব অঙ্ক এক জায়গায় এনে মেলাবার আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই[৪] এক অঙ্কে থামাটা অসম্ভব।

২

সদাচলমান রবীন্দ্রসাধনায় বিচিত্র পরিচ্ছেদবাহী ইতিহাসের অন্তঃশীল ভাবধারা সুত্র-রূপাকারে এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে :

এক ॥ প্রাকৃতিক মহাবিজনে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বিশেষ-আমির যে অধ্যাত্মযোগ তা থেকে বহির্লোকে নিক্রমণাকাঙ্ক্ষায় ও কর্মযোগে আত্মপ্রকাশ—নীরব-নিভৃত নির্জনে আত্মশক্তি-লাভের সাধনান্তে জনযোগ।

দুই ॥ উত্তেজনামুখী ও আন্দোলিত জাতীয় আদর্শের প্রতি আকর্ষণজাত কঠিন কর্তব্য-পালন, এবং তা থেকে মুক্তিকামনায় 'খেয়া' দেওয়া ও সহজ স্ব-ভাবের নির্দেশে জীবন-সাধনাকে রূপদান—অর্থাৎ করা-র আদর্শ থেকে হওয়া-র আদর্শ বরণ।

তিন ॥ পাশ্চাত্যপ্রভাব-বিমুখ ভারতীয়তা থেকে পাশ্চাত্যমিলনমুখিতা—ভারতীয় আধ্যা-ত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য জাগতিকতার সহ-যোগিতা-সহধর্মিতা স্থাপনাকাঙ্ক্ষা।

চার ॥ পাশ্চাত্য ধরনের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের 'রোম্যান্টিক্' কাব্যাদর্শ থেকে ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনাদর্শ তথা মিস্টিক [মরমী]-ভাবধর্ম বরণ, এবং শেষপর্যন্ত মানব-মিলন-জাতিমিলনাদর্শে তথা বিশ্বজাতিকতায় ভাবোত্তরণ; ও সেখানেই জীবনের পরম-সৌন্দর্যচেতনায় সন্ধানলাভ—রোম্যান্টিক কবি থেকে ভারতীয় কবি, ভারতীয় কবি থেকে বিশ্বকবির অর্থাৎ বিশ্বযোগসাধকের ভূমিকা বরণ।

পাঁচ ॥ শাস্ত্র-সংহিতা-বন্দী হিন্দুধর্ম থেকে বন্ধনমুক্ত হিন্দুধর্ম—ব্রাহ্মধর্ম থেকে 'ব্রহ্মধর্ম', এবং সর্ববন্ধনমুক্ত সমুদায় হিন্দুধর্ম থেকে মানব-সভ্যতায় প্রাণবাহী মানবধর্মের অভিব্যক্তি-বাদে প্রত্যয় স্থাপনা—ব্রাহ্মসমাজ থেকে হিন্দুসমাজ ও ভারতসমাজ, এবং ভারতসমাজ থেকে বিশ্বসমাজে উত্তরণ।

ছয় ॥ ক্রমসমন্বিত বা দ্বিপ্রান্তিক জীবন-বোধে একদিকে পল্লীমানবকল্যাণে তথা প্রত্যক্ষমানবকল্যাণে ভাবকর্মীর দায়িত্ব গ্রহণ,

এবং কাব্যে সাহিত্যে সাগ্রহ মানবপ্রীতিযোগ কামনা ; অন্যদিকে নান্দনিক সৃজনলীলায় (সঙ্গীতে নৃত্যে অভিনয়ে আবৃত্তিতে চিত্রাঙ্কনে) বহুবিচিত্র কত সার্বজনীন সুকুমার-সাংস্কৃতিক ভূমিকা গ্রহণ, এবং তারি পাশে সমান্তরালরূপে গভীরতর অধ্যাত্মমগ্নতায় মহাজীবন ও মহাকাল সম্পর্কে চূড়ান্ত আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর-সন্ধান।

ভাবকর্মাশ্রিত রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের বিকাশে ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে বিশ্বভারতী : বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন থেকে বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতনের বহু পরিবর্তন তো রবীন্দ্রনাথের ঐ চলমান আদর্শেরই বহুবিচিত্র রূপায়ণ। ভাবানুপাতিক ঐ বহুবিন্যাস ও তার কালক্রমও এইভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে [দ্র. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যানির্দিষ্ট বিষয়গুলি সরাসরি-সম্পর্কে বাঁধা নয়] :

১ ॥ ১৮৮৮ থেকে [মানসীকাব্যকাল থেকে] ১৯০১ খ্রী. পর্যন্ত রবীন্দ্রজীবনবোধের অন্তর্বিরোধ-বহির্বিরোধের প্রথম উত্তরণ-সীমান্তে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শান্তিনিকেতনে।

২ ॥ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রাথমিক স্তরেই রবীন্দ্র-স্ব-ভাব ও ভাবকর্মরূপের মধ্যে যে বিরোধ-বোধের সূত্রপাত তা থেকে পূর্ণমুক্তি ১৯০৭-৮খ্রী. থেকে।

৩ ॥ ১৯১০-১২ খ্রী. থেকে যে নতুন বন্ধবোধ ও বৃহত্তর এক নবচেতনায় বোধন তার সমন্বয় দর্শনের জন্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যকেন্দ্রের ('The centre of Indian culture'-এর) সন্ধান এবং বিদ্যাসমবায় প্রতিষ্ঠা-ভাবনা, ১৯১৮ খ্রী.।

৪ ॥ বিদ্যাসমবায়কে ভারতীয় ক্ষেত্রসীমা ছাড়িয়ে, একালের সমস্ত বৈষয়িক-রাজনীতিক বিরোধকে আমল না দিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য মানসমিলনতীর্থ তথা ভাববিনিময়কেন্দ্র রূপে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা, ১৯১৯ খ্রী.,—এবং তাকেই বিশ্বজাতিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন, ১৯২১ খ্রী.।

৫ ॥ বিশ্বভারতীর সাংস্কৃতিক মিলনসাধনার অন্তরালে যে অভাবাত্মক বেদনা অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত পল্লীমানবের জীবন ও জীবিকার বৈসাদৃশ্য ও অপূর্ণতার চেতনা, এবং সেখানেও সহজসৌন্দর্যযোগ ঘটানোর সমস্যা—তার একটা মৌলিক সমাধানের সন্ধানেই সুরুলে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা, ১৯২২ খ্রী. ; এবং বনিয়াদী শিক্ষাকে কেবলমাত্র শিল্প-কৃষিস্তরে অর্থাৎ জীবিকাস্তরে বিচ্ছিন্ন না রেখে ঐ শিক্ষাকেই জীবনাদর্শ-সম্মত পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার উদ্দেশ্যে—মনের আনন্দ-বিকাশ ও হাতের সুচারু দক্ষতাকে মিলিত রূপ দেবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব-ভারতী-শ্রীনিকেতনে 'শিক্ষাসত্র' প্রতিষ্ঠা, ১৯২৪ খ্রী. ঐ সুরুলেই।

৬ ॥ জীবনবোধের ও জীবনবিকাশের ভিত্তিস্বরূপ যে শিক্ষা সেই শিক্ষাকে পল্লী-মানবের দ্বারে দ্বারে সহজভাবে পৌঁছে দেবার প্রয়াসে 'লোকশিক্ষাসংসদ'[৭] গঠন, ১৯৩৭ খ্রী.।

শিক্ষাসত্রের পরে সুপরিণত রবীন্দ্রজীবনে ভাবকর্মাশ্রয় প্রধানত কিংবা এককভাবেই অন্তর্মগ্ন, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসাধনাগতভাবে নান্দনিক বহিঃপ্রকাশে তার অজস্র-রূপ পরিচয়—কাব্য ও নাট্যে [নৃত্যনাট্যই প্রধান], চিত্রলেখায় ও অব্যাহত গীতিনৃত্যানুষ্ঠানে তার জনপ্রিয় অ-পূর্ব কত সুকুমার সাংস্কৃতিক স্বরূপ। এবং এরি পাশে পাশে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির দুর্দিনে বাণীকর্মীরূপে ও পল্লীকল্যাণ-উদ্যোগী-রূপে দ্বৈতব্রত পালন।

—রবীন্দ্রজীবনসাধনার উত্তরণ-পথে অব্যাহত এতসব ক্রমবৈচিত্র্যই মুগ্ধচক্ষে

দেখবার মতো, কারণ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে এবং জমিদারীতে পল্লীউদ্যোগে তো রবীন্দ্রজীবনেরই ভাব ও কর্মের ক্রম-অগ্রসর চিত্রমিছিল, এবং ক্রম-উন্মুক্ত দলিলও বটে।

আরো দেখবার বিষয়, সর্বত্রই অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, প্রত্যক্ষের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষের বা লোকজীবনের সঙ্গে লোকাতীত জীবনের, জাগতিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার-নান্দনিকতার মেলবন্ধনের এক অনন্তসাধনা,—এবং সর্বত্রই ক্ষুদ্র সন্তোষকে বৃহৎ আকাজ্ক্ষার দিকে, স্থূলতা বা নিছক বৈষয়িকতাকে সুকুমার সংস্কৃতির দিকে, যা একান্ত ব্যক্তিগত তাকে সার্বজনীন এক প্রীতিপূর্ণ লক্ষ্যে সম্প্রসারিত করার দিকে ক্রমাগত অভিচালনা—রবীন্দ্রজীবনকে কোনো এক ক্ষেত্রেই স্থিতি-বন্দী রাখেনি, রূপরূপান্তর ঘটিয়েছে বহুমুখী অব্যাহত ধারায়। দূরকে বা অলক্ষ্য অলভ্যকে কাছে পাবার একমাত্র উপায় নিকট থেকে দূরে যাওয়া—এই রবীন্দ্রবোধেই তাঁর সমগ্র জীবন সঞ্চালিত, অন্যের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন না করে নিজের ভাবভাবনা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়েও স্ব-ভাব-সিদ্ধরূপেই পূর্ণ জীবনাদর্শের 'সন্ধান-সাধনাই রবীন্দ্রনাথের অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাই অনেক ভাবাদর্শের উদ্দীপনা ও তদনুসারী ভাবকর্মরূপ বা ঐরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনও রবীন্দ্র-স্ব-ভাবে সম্ভব হয়েছে—যা পরবর্তী স্তরে পরিত্যক্তই হয়েছে নয়, তার প্রসঙ্গও রবীন্দ্র-স্মৃতিচারণায় যথারূপে স্থান পায়নি।[৮] আজ রবীন্দ্রনাথের ঐ উদ্বোধিত সত্তার বহু প্রকাশই আমাদের যেমন বিস্ময় সৃষ্টি করে, তেমনি মৃদুহাস্যও বটে (দ্র. দশটি দীক্ষাপ্রদত্ত ব্রহ্মচারী বালককে দিয়েই শান্তিনিকেতনে অধ্যাত্মভারতের নবজাগৃতির মহাপর্ব রচনার মহাস্বপ্ন ও ভাবকর্মারম্ভ—বিংশ শতাব্দীতেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার দ্বারা)।[৯] আগুনে যে পোড়ে কিংবা মধু যে মধুর রবীন্দ্রনাথ তা মুখস্থ করে শেখেননি, এমনকি অন্যকে দেখেও নয়—নিজেই দগ্ধ হয়ে জেনেছেন, এবং জেনেছেন মধুর স্ব-ভাবের স্বাভাবিক অধিকারেই।

৩

বৈচিত্র্যসাধক হলেও রবীন্দ্রপ্রকৃতির মধ্যে আত্মবিরোধ আছে, কিন্তু তাই বরং তাঁকে বারংবার যেমন দুই প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে, তেমনি ঐ বিরোধচেতনাই ব্রতী করেছে একটা সমন্বয়-সীমান্তের সন্ধানে। সর্বাস্তিবাদিতায় সেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যবোধ যেমন হারিয়ে যায়নি, তেমনি একের সন্ধানে বিচিত্রের আনন্দস্পর্শ থেকেও বঞ্চনা ঘটেনি। রবীন্দ্রপ্রকৃতির এই বিরোধ-বৈশিষ্ট্যই তাঁকে বহুমুখী সন্ধানে আত্মপ্রকাশের সুযোগ এনে দিয়েছে—বন্ধনে মুক্তিতে বৃহত্তর লক্ষ্যে উত্তরণ ঘটিয়েছে।

রবীন্দ্রপ্রকৃতি বিরুদ্ধ ধাতুতে গড়া। একদিকে, সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ পার্থিব জীবনের প্রতি প্রাণাকর্ষ তথা মাধ্যাকর্ষ—এবং সেখানে মানবকল্যাণের দায়দায়িত্বের ভাবনা-চেতনা যেমন, তেমনি সেই আকর্ষণ-জাত কর্মযোগের দাবী তথা অসহায় ও অসম্পূর্ণ মর্ত জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং তার সুস্থতা ও সম্পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যে যথাকর্তব্য-সাধন। সম্পর্কটা এখানে সাপেক্ষ বলেই বন্ধনের মূল্য স্বীকৃত এবং সেই হেতুই সম্পর্কটা কোনো একটা আকার না-পাওয়া পর্যন্ত শান্তি থাকে না। রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা এবং মর্তচারিতা তথা বাস্তবমুখিতায় এখানে কেন্দ্রানুগধর্ম প্রকাশিত।[১০] অন্যদিকে, রবীন্দ্র-

প্রকৃতির মধ্যেই জাগরূক থাকে কেন্দ্রাতিগ এক অতিচারী দৃষ্টি[১০]—যার দাবী মর্তের তথা মানবজীবনের সমস্ত সাপেক্ষ সম্পর্ক ও অসম্পূর্ণতার বন্ধনকে লঙ্ঘন করে আনন্দ-চেতনলোকে অবাধ আশ্রয়লাভ। এই লোক হল আত্মমুক্ততার—অধ্যাত্ম-উদাস সৌন্দর্য-মগ্নতার; এখানে অসম্পূর্ণতার বেদনা-যন্ত্রণা ও সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ লোকসম্পর্কের কোনো তরঙ্গাঘাতই গিয়ে পৌছয় না। এই জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও আত্মমগ্ন। বলাই বাহুল্য, এখানে কর্মযোগের বা কর্তব্য-সাধনের প্রশ্নই জাগে না। কারণ ধ্যানযোগ তখন কর্মযোগের ঊর্ধ্বে অবিচল থাকে। রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা অতিবিশিষ্ট ভাব-গভীর রূপ কাব্যে-নাট্যে-সঙ্গীতে এই অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত।

—উল্লিখিত দুই প্রান্তলোক রবীন্দ্রজীবনে বৈষম্য বা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে না, বরং মিলনের জন্যে আর্তি ও সমন্বয়ের জন্যে বেদনা আনে। ঐ দ্বিমুখী রবীন্দ্রসত্তার মধ্যবর্তী রয়েছে আর এক তৃতীয় স্বরূপ, তা দুই প্রান্তিক বৃত্তে দৃষ্টি রেখেও মধ্যস্থিতি রক্ষা করে চলে—দুই পাল্লার মধ্যবর্তী মানদণ্ডের মতো; যেদিক যতই ভারী হ'ক না কেন মানদণ্ডের ব্যত্যয় ঘটে না। মিলন বা সমন্বয় সাধনের জন্যে কখনো কখনো লোকাতীত অধ্যাত্মসৌন্দর্য-মগ্নতাই সর্ব-উদাসীন স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে আসতে চায় মর্তে—লোকজীবন ও বিশ্বমানব সম্পর্কের সুখদুঃখবিরহমিলনের মধ্যে; আবার কখনো বা মানবজীবন মর্ত-জীবনের প্রতি ভালোবাসার সম্পর্কজাত বেদনা ও অসম্পূর্ণতাবোধ থেকে এবং তদ্জাত কর্তব্যচেতনা ও তার দ্বন্দ্বাঘাত থেকে মুক্তিলাভ ঘটে ঐ সম্পর্কেরই লোকাতীত এক অধ্যাত্ম-সুন্দর সুরে। ব্যক্তিক বন্ধন ও লৌকিক সম্পর্কের সমস্ত প্রত্যক্ষ সীমা সেখানে মুছে যায় সার্বজনীন এক ভাবোদার স্ফূর্তিতে। সাপেক্ষই তখন পরিণত হয় নিরপেক্ষরূপে, যা পার্থিব কর্তব্যচেতন তা প্রশস্ত হয় গৃহত্যাগী উদাসীনতায়, যা বাস্তবিক ও দ্বন্দ্ব-জটিল এবং যা অব্যবহিত সমাধানের দাবীতে অপ্রসন্ন তাও শেষপর্যন্ত এসে উপনীত হয় এক সমাহিত শান্তিসীমান্তে—যেখানে জীবনের শত শত অসন্তোষ মহাজীবনের উদাত্তসঙ্গীতে নির্বাণ লাভ করে ধন্য হয়।[১১] দীর্ঘশ্বাসদগ্ধ অশ্রুসিক্ত ও রক্তস্রোতলিপ্ত ধরণীই সেখানে উন্নীত হয়—রূপান্তরিত হয় স্বাগত স্বর্গের মহিমায়, রূপ সমাধি লাভ করে অরূপসাগরে। রবীন্দ্র-জীবনচেতনায় এখানে শেষপর্যন্ত সমস্ত কর্তব্যবোধ নিমজ্জিত হয় অনাহত বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পরিণত জীবন-চেতনায় স্পষ্টতই তাই বলেন যে, তাঁর কর্তব্য-বোধও আসলে সৌন্দর্যবোধ। 'ভালো করে বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস আমার নজরে পড়ে, সে হচ্ছে আমার কর্তব্যবুদ্ধিটা আসলে সৌন্দর্যবোধ।'[১২] —এই সৌন্দর্যবোধের শক্তিতেই বাইরের সঙ্গে বিরোধে ভিতরকে প্রতিষ্ঠিত করে—বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আগ্রহকে প্রবল করে সব ভাঙাচোরাকে মেলাবার সাধনা চলতে থাকে রবীন্দ্রজীবনে। কবি-ধর্মই একমাত্র রবি-ধর্ম নয়—'রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই' তাঁর মুক্তি নেই,—'সব হিসাবকে একটা চরম অঙ্কে' মেলানোর সমস্যাটা 'অত্যন্ত কঠিন' বলেই জীবনবিধাতার কাছে পার পাবেন না—রবীন্দ্রনাথ তা ভালোভাবেই জানেন।[৪] রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রাসঙ্গিক কথা—'আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম

দৌরাত্ম্য আছে বলেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্যে এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল কান্না।'[১২] —বিরোধের মধ্য দিয়ে মুক্তি-সাধনা ও সেই সাধনায় সৌন্দর্যবোধের নিয়ন্ত্রণ ও উত্তরণ-শক্তি রবীন্দ্রজীবনধর্মের সঙ্গতিপূর্ণ শেষ-ব্যাখ্যানে বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং তাৎপর্যময়; কারণ ঐশী-বিধানে ধ্রুব-প্রত্যয় কিংবা মানবিক কল্যাণ-শক্তির চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে বেদনাবহ সংশয়ের দ্বারা প্রান্তিক রবীন্দ্রজীবন আক্রান্ত ও আহত।

রবীন্দ্রজীবনের বহু বিচিত্র রূপলোক তাঁর অন্তর্যামী এক মিতা-সুন্দরের স্মিতহাসিতে আনন্দময়। এখানে বিরোধ-বিক্ষোভের তরঙ্গাঘাত এসে পৌঁছয় না, তাই সর্বাস্তিবাদীর জীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যসুষমা বিরাজ করতে পারে। দুইপ্রান্তবর্তী রবীন্দ্রজীবন-ধর্ম বারংবার দোলাচল-অবস্থার মধ্যবর্তী রবীন্দ্রজীবনধর্মের মানদণ্ডে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। রবীন্দ্রসাধনায় সর্বাস্তিবাদী রূপের এখানেই মৌল বিশেষত্ব। বাস্তব ও আদর্শের তথা ভব ও ভাবের শতমহলে সুষম আত্মপ্রকাশের সাধনায় রবীন্দ্রজীবন ও সাধনা তাই বড়ই তাৎপর্যময়। বহুমুখী দীপালোকে এ যেন পরম সুন্দরেরই আরতি।

৪

রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রের রসসাধক হলেও মূলত সর্বরূপের মধ্যমণিরূপে প্রেমিক। যে ত্রিশক্তি পারস্পরিক সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে এক গভীর ব্যাকুলতা সৃজন করেও তাঁর জীবন-বোধকে ক্রম-অগ্রসর করে দিয়েছে তা হল প্রকৃতিপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম। পৈতৃক জমিদারীজগতে শিলাইদহ-কেন্দ্রিত পল্লীবঙ্গে এদের উন্মেষ ও বিশেষক্ষেত্রজ অব্যাহত বিকাশ ঘটলেও, শান্তিনিকেতনেই সর্বপ্রথম এদের মধ্যে সমন্বয়-সুষমা লক্ষ্য করা যায়। প্রেমই জ্ঞানকে হৃদয়রঞ্জিত এবং দৃষ্টিকে স্বপ্ন-কল্পনায় অপ্রত্যক্ষ মায়ালোকে প্রসারিত করে আত্মকাম রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকাম রবীন্দ্রনাথ করে তুলেছে। ফলে, হয়ত বা মনীষা ও জ্ঞানের উপরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস হারিয়েছেন, কিন্তু প্রেমের উপরে বা মানবিক ধর্মের প্রাধান্যের উপরে কখনোই নয়। বরং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জ্ঞানধর্ম ও প্রেমধর্মে বারংবার ঐক্যসুষমার সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলেছে—কিন্তু শেষপর্যন্ত জ্ঞানের চেয়ে প্রেমের আকাঙ্ক্ষাই ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে অধিকার করতে চেয়েছে।

ক ॥ প্রকৃতি : রবীন্দ্রজীবনের রুদ্ধদ্বার মোচনের কাজে সর্বপ্রথম প্রেমের 'হাত বাড়িয়েছে ঈশ্বর নয়, মানুষ নয়,—প্রকৃতি। একদিন প্রভাতে বাল্যের এক বাতায়ন-পথে বিশ্বপ্রকৃতিই তার অরুণ আলোর কর বাড়িয়ে বালক রবীন্দ্রনাথের রুদ্ধসত্তাকে বাইরে ডেকে এনেছিল,—পাষাণকারা থেকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ঘটেছিল সুদূর সমুদ্রসঙ্গীতের ব্যাকুল আহ্বানে।[১৩] তারপর পল্লীবঙ্গের ভাসমান জীবনে নদীবক্ষে নদীতটে ও নির্জন চরে সেই প্রকৃতিই তার ভিতর-বাহিরের বিচিত্র মহলে বিচরণের চাবিকাঠিটি একদিন তুলে দিল তরুণ কবির দক্ষিণ হাতে। সেই থেকে প্রকৃতিপ্রেমের এই নিগূঢ় দায়িত্বটি তিনি কখনোই আর বিস্মৃত হননি। বরং এই সম্পর্কের মধ্যে তিনি বহু-বিরোধের মধ্যে নির্বিবাদ ও নিভৃত আশ্রয় গ্রহণ করতে পেরে স্বস্তির সন্ধান পেয়েছেন বারংবার। বস্তুত, প্রকৃতি-সম্পর্কের অতিপ্রাধান্যই অন্য সম্পর্ককে সঙ্কুচিত বা এমনকি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। স্বার্থবন্ধনমুক্ত শান্তিনিকেতনে এসে অধ্যাত্মবিকাশের প্রেরণায় প্রকৃতি-

আহ্বানকেই তিনি সর্বাত্মক বিচিত্রতায় বরণ করেছেন আপন সুকুমার জীবনসাধনার মধ্যে। সৌন্দর্যসাধনার বহুব্যাপক প্রকাশ ঘটেছে কাব্যে-সঙ্গীতে-নাট্যে, তেমনি ঋতু-উৎসবে অভিনয়ে রবীন্দ্রসঙ্গত শিক্ষাপরিবেশে রচনায় ও আন্তরিক পরিবেশনে। কেবলমাত্র মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশক্ষেত্রে জগৎপ্রকৃতি-বিশ্বপ্রকৃতিই এক মৌল অনুকূল শক্তি নয়, বরং অধ্যাত্ম সাধনার পরমাশ্রয় রূপেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতিলোকে একাত্ম হওয়ার আনন্দে আত্মমগ্ন ছিলেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথের মতোই আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবাদের সাধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—প্রকৃতিচেতনা ও অধ্যাত্মচেতনার সেখানে মিলন-সঙ্গম। তবুও, ক্রমান্বয়ে জীবনমধ্যাহ্নের শেষপ্রান্তে পৌঁছে প্রকৃতির চেয়েও দ্বন্দ্বজটিল ও বিবর্তনমুখী মানবজীবনের মহামূল্য চেতনায় তিনি কখনো বা উদ্বোধিত হয়ে উঠেছেন। প্রকৃতি যে মানবজীবন-নিরপেক্ষভাবেই সামঞ্জস্য-সুন্দর, এবং সেই সৌন্দর্যে ও সামঞ্জস্যেই যে মানুষের চলে না, তাকে নতুনতর সৃষ্টির বহু সাধনায় ঐক্য রচনা করতে হয়—সেই নব-চেতনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়।[১৪] কিন্তু তবুও, রবীন্দ্রনাথকে বিরোধ আঘাত ও সঙ্কীর্ণতা অসম্পূর্ণতার মধ্য থেকে বারংবারই আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে চিরঅনুকূল প্রকৃতির কোলে—বারংবার অগ্রজ জগৎ-প্রকৃতির নিকট থেকেই গ্রহণ করতে হয়েছে শান্তিপ্রেমসাম্যের মানবপ্রাকৃতিক মহামন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের রচনায় এই প্রকৃতি-আশ্রয় নানা অনভিপ্রেত সম্পর্কের ও বিরূপ চেতনার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবেই রবীন্দ্রজীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। যুদ্ধসংঘাত ও দানবীয় ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে তাই অসহায় কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় এই অন্তিম প্রার্থনা:

'আর্তধরার প্রার্থনা এই শুন—
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন।'[১৫]

খ॥ অন্যদিকে, জমিদার-জীবনের অন্তরালে আত্মমগ্ন অনুভবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে 'আমার ধর্ম'[১৬] গড়ে উঠছিল এবং মহাবিজনলোকে জগদীশ্বরের সঙ্গে 'বিশেষ-আমি'-র যে বিশেষ-সম্পর্ক গড়ে উঠছিল তা-ই শান্তিনিকেতনের সমবেত সাধনার মধ্যে প্রকাশিত হতে গিয়ে রূপরূপান্তরে পরিণতি লাভ করল। যে ঈশ্বরবোধ ছিল কখনো একান্ত ব্যক্তিগত এবং কখনো বা সম্প্রদায়গত (রবীন্দ্রনাথ এককালে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—সেকথা স্মরণীয়) তা-ই গণ্ডী ভেঙে হয়ে উঠল জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্বজনীন। ব্রাহ্মধর্মই ক্রমোত্তরণ-পথে পরিণতি লাভ করল মানবধর্মরূপে। ঈশ্বরবোধ শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হল মহামানব-চেতনায়। পশুত্ব-দেবত্বের সংগ্রামে মহাবিজয়ী ও মহাভবিষ্য-স্রষ্টা এই মহামানবই নিখিল সৃষ্টির আধ্যাত্মিক শক্তির সংহত ও পূর্ণাঙ্গ আবির্ভাব-বিশেষ।

গ॥ মানব: আবার, জমিদারীজগতে আদিপ্রকৃতির মধ্যে মানবজীবনের (সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রজালোকের) অসহায় ও অসম্পূর্ণ মূর্তি দেখে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে কর্মমুখী বিবেকচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তা-ই বহি-র্বাধামুক্ত ও নিরপেক্ষ এক স্বকীয়-স্বাধীন ক্ষেত্রের সন্ধান পেল শান্তিনিকেতনে। ব্রহ্ম-চর্যাশ্রম থেকে বিশ্বভারতী পর্যন্ত এই যাত্রাপথ রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ভবিষ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে সম্প্রসারিত, এবং শ্রীনিকেতন-এ সেই পথ

কাছের-মানুষ-যারা তাদের কাছে সমাগত।—এখানেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি পল্লী-প্রজাভাবনা, ভারত-ভাবনা তথা স্বাদেশিক জীবন-ভাবনার পরিক্রমা বিশ্বমানব-ভাবনায় ক্রমোন্নত। আর, বিশ্বমানবমিলন-ভাবমহিমার *যে সুদূর স্বপ্নজ্যোতি (vision) এবং* তারই পাশে প্রিয়-পরিচিত সাধারণ মানবের কল্যাণ-ভাবনা ও তাদের সঙ্গে প্রীতিযোগের কামনা রবীন্দ্রসত্তাকে তা ক্রমেই ব্যাকুল করে তুলেছে। কোনো বৃহৎ আদর্শের উজ্জীবন ব্রত নয়, সাধারণ মানুষের প্রেমপ্রীতি-স্পর্শের আকাঙ্ক্ষাই মানবজীবনের নতুন মূল্যস্বীকৃতিতে তাঁকে নতুন ভাবে উদ্বোধিত করেছে—এটা বিশেষ করে ঘটেছে কবিজীবনের প্রান্তসীমায়।[১৭] তবে এটাও আকাঙ্ক্ষা—অধিকার নয়; পূর্বাভাস—প্রকাশ নয়; সূচনা—প্রত্যয় নয়। এবং নয় বলেই বেদনার মায়াঘেরা।

৫

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী জীবনসাধনায় প্রকৃতি-মানব-ঈশ্বর সম্পর্ক সহোদর-স্বরূপের চলমান এক মিলনক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল প্রাকৃতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিশক্তির মিলনেই জীবনের প্রকাশ ও সভ্যতার বিকাশ সম্ভব, আর এ ক্ষেত্রে ত্রিবেণী না হয়ে ত্র্যহস্পর্শ ঘটলে ব্যর্থতা-অসম্পূর্ণতা অনিবার্য। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে আশ্রমের প্রয়োজন এই ত্রিবেণী-সঙ্গম রচনার জন্যেই, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার বহু পরেও রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকেতন তাই বিংশশতাব্দীতেও আশ্রমবিশেষ[১৮]—যেখানে মনুষ্যত্বের পূর্ণবোধন সম্ভব প্রকৃতি-মানব-ঈশ্বরের সুষম মিলন-সৌষ্ঠবে,—এদের কোনোটিকেই বাদ দিয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র প্রকৃতিপ্রেমিক বা ঈশ্বরপ্রেমিক বা মানবপ্রেমিক মাত্র হলেও জীবনসাধনায় সমন্বয়-সীমান্ত বা শেষ সীমান্ত দর্শন হয়ত বা সম্ভব ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বাস্তিবাদী—কখনই একমাত্র একরূপী কিছু নন, কিংবা চেতনায় ও অনুভবে ঐরূপ এক-*মাত্র-কিছুতে* বন্দী থাকার আদর্শে (ভাব ও রূপের কোনো ক্ষেত্রেই) বিশ্বাসী নন। তবে, ক্রমাস্তমান রবিলোকে এমনকি প্রকৃতিভাবনা ও ঈশ্বরভাবনায় চেয়েও, মানবভাবনা কিছু গুরুত্ব লাভ করেছে। হয়ত বা এটাও প্রাক্‌কালীন প্রকৃতি ও ঈশ্বর ভাবনায় অতিপ্রাধান্যের প্রতিক্রিয়াজনিত ভারসাম্য-রক্ষার প্রান্তিক প্রয়াস, হয়ত বা মর্তজীবন ও জনমানবের প্রতি মানবিক দৃষ্টির মায়াকরুণ শেষ রশ্মিপাত।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে মননে ও কর্মে বহুমুখী উত্থান-অবতরণজাত পরিবর্তন-বৈচিত্র্য বিশেষ-ভাবেই চোখে পড়ে এবং বিছিন্নভাবে দেখলে তার মধ্যে বহু আপাতবিরোধ ও অসামঞ্জস্য প্রকট হয়ে পড়ে। এমনকি একাংশকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র স্বরূপে বেঁধে আরেক অংশকে তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিতও করা যায়, কিন্তু তা হয় বহুধারার সঙ্গমদর্শনের বদলে একটি মাত্র প্রবাহের রূপ কিংবা সেই প্রবাহেরই একটি মাত্র আকস্মিক চিত্রদর্শন তুল্য। রবীন্দ্র-জীবনমননকর্মে ঐক্যসূত্রের সন্ধানলাভ এবং *সেই সূত্র ধরে* মুক্তবেণী-যুক্তবেণী রবীন্দ্রজীবন-সাধনাকে জানাই রবীন্দ্রনাথকে অখণ্ডভাবে অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপে জানা। কেবল মুক্তবেণী বা যুক্তবেণীর গঙ্গাই গঙ্গা নয়, এমনকি বারাণসীর গঙ্গাও সমগ্র গঙ্গার মহিমা বহন করে না। প্রবহমান রূপে সমস্তের মধ্যে সবকিছুকে না জানতে পেলে—উৎস থেকে সমুদ্র-সঙ্গম পর্যন্ত বহুবৈচিত্র্য দেখতে না পেলে—

কেবলমাত্র এক বাঁকের বৃহৎ অভিব্যক্তিকে বা একটি তরঙ্গিত স্বরূপকে বা এমনকি একটি আন্দোলিত কিংবা প্লাবিত রূপকেও প্রবাহের চেয়ে প্রাধান্য দিলে কেবলমাত্র খণ্ডপরিচয় লাভই সম্ভব নয়, বিরুদ্ধ ও অসত্য উপসংহারে উপনীত হওয়ার মতো বিভ্রান্তিও সম্ভব। (দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা আজকালকার রেওয়াজ !)। রবীন্দ্র-সাধনার এক-একটি শাখাস্রোতেও দুকূল-সম্পর্কের বৈচিত্র্য-যোগ, আবার সামগ্রিক-ভাবেও বিভিন্ন শাখাস্রোতে অন্তরে-বাহিরে যে দ্বন্দ্বসংঘাত আছে তা-ই অগ্রপশ্চাৎ ভূমিকায় অথবা পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় সুদূর সমুদ্রসঙ্গমেরই সন্ধানী। রবীন্দ্রজীবনের প্রবাহপথে মানসসরোবর থেকে এই সমুদ্র-সন্ধান পূর্ণদৃষ্টির কাজ—কাছ থেকে দেখা, দূর থেকে দেখা এবং কাছে ও দূরে মিলিয়ে দেখাটা সামগ্রিক দৃষ্টিরও কাজ বটে। সর্বশেষ কথা, রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথমে রবীন্দ্ররচনার আলোকেই দেখতে হবে ; আর, রবীন্দ্রনাথের স্বরচনার বিপুলা বসুন্ধরা এই আলোকেই দীপান্বিতা।

উদ্ধৃতিসূত্র ও উদ্ধৃতিপ্রসঙ্গ

১। নৈবেদ্য, ৩০ সংখ্যক কবিতা ; ২। ছিন্নপত্রাবলী, সংখ্যা ১০৭ ; ৩। রম্যাঁ রলাঁ লিখিত ফরাসী গ্রন্থ 'Inde', পৃ. ১৫৬ ; অনুবাদসূত্র : কালান্তরের পথিক রম্যাঁ রলাঁ ; প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত কৃত ; ৪। পথে ও পথের প্রান্তে, পত্রসংখ্যা ১৩ ; ৫। ১৯০৫-এ লেখা 'খেয়া' কাব্যপ্রসঙ্গও দ্রষ্টব্য ; ৬। ঐ নামীয় পুস্তিকা ; ৭। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র তিনচার বৎসর আগে তাঁর লোককল্যাণ-আকাঙ্ক্ষার সর্বশেষ রূপবিশেষ—সাধারণের জন্য এই লোকশিক্ষা সংসদ প্রকাশ করে অল্পদামে ও গুরুত্বপূর্ণ বহুবিষয়ে সুলিখিত গ্রন্থমালা : প্রাসঙ্গিক সূত্রে দ্র রবীন্দ্রজীবনী ও সাহিত্যপ্রবেশক, ৪র্থ খণ্ড, [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত] ; ৮। বিশ্বভারতী গ্রন্থের আঠারোটি রবীন্দ্রভাষণে (১৯১৯-.৯৪১ খ্রী.) এবং 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'-এ প্রায়ই তিনি স্মৃতিচারণা করেছেন, কিন্তু শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠামুখীন ভাবভাবনার যথার্থ স্বরূপকে অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। যথার্থ সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য চি. প. ৬—সুহৃদ জগদীশচন্দ্রের নিকট লিখিত, কাল ১৯০১ খ্রী. ; ৯। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাকেন্দ্রিক ও প্রতিষ্ঠামুখীন রবীন্দ্রপ্রত্যাশা ছিল দেশীয় রাজাদের অনুদানেই অবৈতনিক শিক্ষা-আহার-বাস-ব্যবস্থা চলিত থাকবে—প্রাচীনকাল-সম্মতভাবে, কিন্তু আশাভঙ্গ ঘটতে বিলম্ব হ'ল না, এবং যথাসম্ভব কমব্যয়ে হ'লেও সবেতন শিক্ষাব্যবস্থা চালু হ'ল। ১০। চি. প. ৫নং, পত্রসংখ্যা ১, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, ১১। দ্র. চিত্রাকাব্য, 'এবারে ফিরাও মোরে' কবিতার শেষাংশ ; ১২। পথে ও পথের প্রান্তে, ১১ সংখ্যক পত্র ; ১৩। কড়ি ও কোমল কাব্য, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ . ১৪। আত্মপরিচয়, ৩ সংখ্যক প্রবন্ধ ; 'বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে……মিলতে চাই' ; ১৫। নবজাতক, পক্ষীমানব শেষাংশ ; ১৬। ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৩৯ এবং ২৩৮ ; ১৭। দ্র. শেষ লেখা, ১০ সংখ্যক কবিতা : জন্মদিনে, ১০ সংখ্যক কবিতা : আরোগ্য, ১০ ও ২৯ সংখ্যক কবিতা ; ১৮। 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থ শেষভাষণ, ১৯ ও ১৭ সংখ্যক ; বা আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ৩ সংখ্যক প্রবন্ধ।

শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দমূলক গ্রাম-নাম

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

কনকনে শীতের রাতে ফিনফিনে জামা-টামা প'রে ঘুটঘুটে অন্ধকারে টোটো করা যাদের অভ্যাস, তারা যে মাঝে মাঝে ঘুষ-ঘুষে জ্বরে প'ড়ে ঘ্যানঘ্যান করবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এই কল্পিত বাক্যটিতে ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে, সেগুলির মর্যাদা রীতিমত বাংলা শব্দের থেকে কম হ'লেও ভাবের উপযুক্ত প্রকাশ অথবা বর্ণনাকে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্ত তাদের বিশেষ প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এই-জাতীয় শব্দের প্রতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্বের কথা সুবিদিত। তিনি একদা লিখেছিলেন—'সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল অনুযাত্রিক থাকে, তাহারা রীতিমত সৈন্য নহে, সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাংলা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমত শব্দশ্রেণীতে ভর্তি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মানপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের, অথচ অখ্যাত, অবজ্ঞাত; ইহারা না থাকিলে বাংলা ভাষার বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।…এই ধ্বনিগুলির সহিত অনুভূতির কোনও শব্দগত সাদৃশ্য নাই, তবু এই নিরর্থক শব্দগুলির দ্বারা অনুভূতির যেমন স্পষ্ট ধারণা হয়, এমন আর কিছুতেই হইতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনায় এই ব্রাত্য শব্দগুলির এত সুপ্রচুর ব্যবহার ক'রে গেছেন যে, তৎসম তদ্ভব শব্দের সঙ্গে একাসনে বসতে আগে তাদের ক্ষেত্রে যেটুকু বা বাধা ছিল, এখন তা আর নেই। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর', 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান', 'ঝনঝনি ঝনঝনি খঞ্জনি বাজে', 'শালিখরা সব মিছিমিছি/লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি', 'ঝিলিমিলি করে পাতা ঝিকিমিকি আলো'—তাঁর কাব্য-ভাণ্ডার থেকে যদৃচ্ছ-নির্বাচিত দু'একটি মণিমুক্তা মাত্র।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শব্দের বংশ-পরিচয় খুঁজতে যাওয়া বৃথা; তাৎক্ষণিক রম্যতা ও শ্রুতিমধুর ঝংকারেই তারা স্বপ্রকাশ। সেজন্য, বর্তমান নিবন্ধে সেগুলির ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ের চেষ্টা কদাচিৎ করা হবে। কট্টর ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণদের হাতে সে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করাই শ্রেয়।

শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি এখন ভাষার স্থায়ী অঙ্গ হওয়ায়, বর্ণনার সৌকর্য-সাধন বা অনুভূতির স্পষ্টতাবিধানের মধ্যেই তাদের ব্যবহার আর সীমিত নেই। ব্যক্তি-নাম বা স্থান-নামের ক্ষেত্রেও তাদের প্রয়োগ ঘটেছে।

আমার পরিচিত দুই শিশুকন্যার ডাক-

---

* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ভূতপূর্ব সচিব। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস.। 'বাঁকুড়ার মন্দির', 'দেখা হয় নাই', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি' প্রভৃতি বঙ্গসংস্কৃতিমূলক গ্রন্থাবলীর লেখক এবং নবপর্যায়ে রচিত বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া ও দার্জিলিং জেলা গেজেটিয়ারের সম্পাদকরূপে সুপরিচিত গবেষক ও সাহিত্যিক। ইঁহার আসন্নপ্রকাশ 'পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম' গ্রন্থেরই অংশবিশেষ এ প্রবন্ধ।

নাম 'টুনটুনি' ও 'টুনটুনি'। কচি ছেলেমেয়ের আদরের নাম হিসেবে 'টুনটুনি' এবং 'সোনা-মোনা'ও বহুলপ্রচলিত। বড়দের মধ্যে, রামধাম বসু ও হাসিরাশি দেবীর নাম মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথকে 'রবিকবি' এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতকে 'কাশীদাসী' মহাভারত আখ্যায় অভিহিত করার মধ্যেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ-সৃষ্টির প্রয়াস স্পষ্ট। খুঁজলে, ব্যক্তি-নামের অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধের বিষয় যেহেতু গ্রাম-নাম, সেজন্য সে-প্রসঙ্গেই এখন অবতীর্ণ হওয়া যাক।

দমদম এবং বজবজ স্থান-নাম দুটি সকলেই জানেন। শব্দদ্বৈত প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন এ-দুটি নাম শহরের (গ্রামের নয়) ব'লে, সেগুলি শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হ'ল। কিন্তু দমদমা নামের ১১টি, ঝুমঝুমি নামের ৬টি এবং বজবজিয়া নামের যে ১টি পল্লী পশ্চিমবাংলায় বিদ্যমান, সেকথা সকলে জানেন কিনা সন্দেহ। 'চলন্তিকা' অনুসারে, আরবী দম্‌দমহ্‌ শব্দ থেকে উৎপন্ন দমদমা কথাটির অর্থ—'চাঁদমারির জন্য মাটির উচ্চ স্তূপ'। গ্রাম-পরিক্রমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এসব ঢিপি সর্বত্রই যে চাঁদমারির জন্য তৈরী হয়েছিল এমন নয়, প্রাচীন ইমারত ধূলিসাৎ হয়ে স্তূপ সৃষ্টির কারণে বা স্থানীয় প্রাকৃতিক টিলার সুবাদেও গ্রামের এহেন নামকরণ হয়েছে। আর, ঝুমঝুমি যে দমদমার কথ্য রূপান্তর, সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র বা তুচ্ছার্থে, তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। বজবজিয়া-র ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের চেষ্টা করা বৃথা। সেটিকে, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায়, 'হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন' মনে ক'রে সন্তুষ্ট থাকাই ভাল।

উল্লিখিত ১৭টি গ্রামের অবস্থান নির্দেশ করবার পূর্বে ব্যাখ্যামূলক দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। কোন্‌ পল্লী কোথায় অবস্থিত তা সঠিকভাবে বোঝাবার জন্য এ-নিবন্ধে প্রতিটি গ্রাম-নামের অব্যবহিত পরে, বন্ধনীর মধ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলা ও থানার নাম পর পর উল্লিখিত থাকবে। যেখানে একই নামের পল্লীর সংখ্যা বেশী (দৃষ্টান্ত—দমদমা বা ঝুমঝুমি), সেখানে কোন্‌ জেলায় তাদের কয়টি অবস্থিত শুধু সেইকথাই বলা হবে। যেমন, দমদমা (১১টি) (২৪-পরগণা—২, দার্জিলিং—১, পশ্চিম দিনাজপুর—২, বর্ধমান—১, বীরভূম—১, মালদহ—১, মেদিনীপুর—১), ঝুমঝুমি (৬টি) (পুরুলিয়া—৫, বাঁকুড়া—১) এবং বজবজিয়া (মেদিনীপুর : খেজরী)।

দমদম কিংবা বজবজের মতো সুপরিচিত না হ'লেও ঝিলিমিলি (বাঁকুড়া : রাণীবাঁধ), ধপধপি (২৪-পরগণা : বারুইপুর), ও ফুরফুরা-র (হুগলী : জাঙ্গিপাড়া) নাম হয়ত অনেকে শুনে থাকবেন। এ-গ্রামগুলিতে আমি একাধিকবার গিয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি ব'লে বলতে পারি—প্রথমটিতে এমন কিছুই নেই যা থেকে ঝিলিমিলি নামটির উৎপত্তি দূরাগতভাবেও সম্ভব। বহুকাল যাবৎ দ্বিতীয় পল্লীর প্রধান, এমন কি একমাত্র, আকর্ষণ বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায় বা দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। তাঁর সঙ্গে (বা সে-গ্রামের অন্য কিছুর সঙ্গে) ধপধপি নামটির যোগাযোগ কল্পনা করাও কঠিন। আর, তৃতীয় স্থানটি যে-পীরের কবরের জন্য বিখ্যাত (এবং যেটিকে অবলম্বন করে সেখানকার জনজীবন চিরাচরিত ধারায় প্রবাহিত), তাঁর সঙ্গে ফুরফুরা নামটির লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। এ তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়ে, হয়ত প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে, আবার বোঝাবার চেষ্টা

করলাম, শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দমূলক গ্রাম-নামগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃথা।

আলোচ্য নামগুলির বিস্তারিত উল্লেখের আগে শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক এই দুই বিভাগে তাদের আনুমানিক সংখ্যা কত তা ব'লে নেওয়া ভাল। আমাদের ঈষৎ-সংক্ষেপিত বর্তমান তালিকায় প্রথম শ্রেণীতে আছে মাত্র ৪টি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে মোট ৭৬টি। অতএব, একথা হয়ত বলা যায়, এসব নামের নির্বাচনে গ্রামীণ জনমানস ধ্বন্যাত্মক অভিধার প্রতি অনেক বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। নামগুলি জেলাওয়ারি না দেখিয়ে বর্ণানুক্রমিক ভাবে দেখানোই সমীচীন। তাতে অনুরূপ নামগুলির বিস্তৃতিক্ষেত্র কতখানি তা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। যেমন, চকচকি নামের ২টি গ্রাম আছে বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুরে আর প্রায়-সদৃশ চকচকা আখ্যার ১টি আছে কোচবিহারে। প্রস্তাবিত বিন্যাস অনুসারে, এ-দুটি নাম পাশাপাশি বা কাছাকাছি উল্লিখিত হ'লে তাদের সুপরিসর বিস্তৃতিক্ষেত্র এক নজরেই চোখে পড়বে, যা জেলাওয়ারি বিভাগ থেকে অত সহজে প্রতীয়মান হবার সম্ভাবনা কম। আবার, জলজলা ও জলজলি আখ্যার দুটি পল্লী বাঁকুড়া ও সংলগ্ন জেলা মেদিনীপুরে অবস্থিত হওয়ায় এহেন অনুমান হয়ত অসঙ্গত নয় যে, এ-রকম নামের আবেদন সংকীর্ণপরিসর এক এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। গ্রাম-নাম অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এসব তথ্য উদ্ঘাটনেরও সবিশেষ প্রয়োজন আছে।

শব্দ-দ্বৈতমূলক ৪টি পল্লী-নামের বিবরণ—কোলকোল (বর্ধমান : গলসি), গোগো (মুর্শিদাবাদ : খান্দোয়ান), বুদবুদ (বর্ধমান : গলসি) এবং সরসর (পশ্চিম দিনাজপুর : করণদীঘি)।

ধ্বন্যাত্মক নামগুলির বৈচিত্র্য ও প্রাপ্তি-ক্ষেত্রের পরিসর অনেক বেশী। বর্ণানুক্রমে, তাদের পরিচিতি—আমজাম (মেদিনীপুর : নয়াগ্রাম) (অতীতে এ-দুটি ফলের গাছ কি সেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল?), ইলাবিলা (বাঁকুড়া : রাইপুর), কড়কড়া (পুরুলিয়া : জয়পুর), কড়কড়ি (৩টি) (বাঁকুড়া : ছাতনা—২/বীরভূম : দুবরাজপুর), কড়কড়িয়া (২টি) (নদীয়া : নাকাশিপাড়া/বীরভূম : রামপুরহাট), কুড়কুড়ি (হুগলি : আরামবাগ), কেচকেচিয়া (বীরভূম : খয়রাসোল), কেলেমেলে (বাঁকুড়া : বিষ্ণুপুর), কোলসোল (মেদিনীপুর : গোপীবল্লভপুর), খড়খড়ি (বাঁকুড়া : সিমলাপাল), গড়গড়া (বীরভূম : দুবরাজপুর), গড়গড়িয়া (৩টি) (বীরভূম : সাঁইথিয়া/মেদিনীপুর : গোপীবল্লভপুর ও দাঁতন), গণগনিয়া (বর্ধমান : মন্তেশ্বর), গুড়গুড়িয়া (পুরুলিয়া : পারা), গুড়মুড় (মেদিনীপুর : গোপীবল্লভপুর), ঘুনঘুনি (মেদিনীপুর : ডেবরা), ঘুনঘুনিয়া (নদীয়া : চাকদহ), চকচকা (কোচবিহার : কোচবিহার), চকচকি (২টি) (পশ্চিম দিনাজপুর : চোপড়া / বাঁকুড়া : ছাতনা), চিকচিকা (বাঁকুড়া : বাঁকুড়া), চুচুরমুচুর (দার্জিলিং : খড়িবাড়ি) (অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্বন্যাত্মক গ্রাম-নাম), জলজলা (বাঁকুড়া : পাত্রসায়ের), জলজলি (মেদিনীপুর : ঝাড়-গ্রাম), জলজলিয়া (বীরভূম : বোলপুর), জাতিমাতি (মেদিনীপুর : রামনগর), জালুমালু (মেদিনীপুর : ভগবানপুর), ঝনঝনিয়া (২৪-পরগণা : হাবড়া), ঝলঝলি (২টি) (কোচবিহার : কোচবিহার ও তুফানগঞ্জ), ঝিলিমিলি (পূর্বে বর্ণিত), টিংলিং (দার্জিলিং : মিরিক) (আদর্শ ধ্বন্যাত্মক নাম), টুরটুরি

(জলপাইগুড়ি : আলিপুর দুয়ার), ঠকঠকি (পশ্চিম দিনাজপুর : গোয়ালপোখর), ঠুনঠুনিয়া (পশ্চিম দিনাজপুর : চোপড়া), ডাংরাডাংরি (পশ্চিম দিনাজপুর : চোপড়া), ডুমডুমি (পুরুলিয়া : পুরুলিয়া মফঃস্বল), ঢনঢনিয়া (৩টি) (কোচবিহার : মাথাভাঙ্গা—২/২৪-পরগণা : মগরাহাট), থকথকি (পশ্চিম দিনাজপুর : গোয়ালপোখর), থিলবিল (পশ্চিম দিনাজপুর : ইটাহার), দমদমা (পূর্বে বর্ণিত), দলদলা (বীরভূম : রাজনগর), দলদলি (১২টি) (মেদিনীপুর—৬, পুরুলিয়া—৩, বাঁকুড়া - ২, কোচবিহার—১), (চক) দামকামু (বাঁকুড়া : কোতলপুর) (ব্যক্তি-নাম সম্ভূত ?), দুবেবুদে (মেদিনীপুর : কেশিয়ারী), দুমদুমি (পূর্বে বর্ণিত), দুলদুলি (২৪-পরগণা : হিংগলগঞ্জ), দোলাচোলা (মালদহ : হবিবপুর), ধপধপি (পূর্বে বর্ণিত), ধাপধারা (বীরভূম : নানুর), ধাবধারা (২টি) (২৪-পরগণা : হাবড়া/বর্ধমান : জামালপুর), নোনাঘোনা (২৪-পরগণা : বসিরহাট), পাটনিপাটনা (মেদিনীপুর : নারায়ণগড়), পুটপুটে (মেদিনীপুর : তমলুক), ফুরফুরা (পূর্বে বর্ণিত), বজবজিয়া (পূর্বে বর্ণিত), বনবনিয়া (২৪-পরগণা : হাবড়া), বলবলিয়া (২টি) (২৪-পরগণা : বারুইপুর ও মগরাহাট), বিড়বিড়া (৩টি) (মেদিনীপুর : কেশিয়ারী, নারায়নগড় ও মেদিনীপুর), বুড়াবুড়ি (৩টি) (কোচবিহার : মাথাভাঙ্গা ও মেকলিগঞ্জ/ মেদিনীপুর : ভগবানপুর), বুড়ুলবাড়ুলহাটি (হুগলি : জাঙ্গিপাড়া), বশাবিশা (মেদিনীপুর : কাঁথি), রাণারাণী (মেদিনীপুর : বিনপুর), লটপটিয়া (মেদিনীপুর : সুতাহাটা) (চমৎকার দেশী শব্দজাত নাম), লালিপালি (মুর্শিদাবাদ : সাগরদীঘি), শিরুপাড়ু (মুর্শিদাবাদ : বাল্দোয়ান), শুকুরপুকুর (মুর্শিদাবাদ : বেলডাঙ্গা), সইলমইল (বীরভূম : নলহাটি), সীমাসীমি (বর্ধমান : গলসি), হরহদি (৩টি) (মেদিনীপুর : গড়বেতা, নয়াগ্রাম ও বিনপুর); হরহরি (মুর্শিদাবাদ : সাগরদীঘি) (ওই অভিধায় কোন স্থানীয় দেবতার নামানুসারে?), হলহলি (মেদিনীপুর : গোপীবল্লভপুর), হামজামপুর (হুগলি : বলাগড়), হিমসিম (মালদহ : গাজোল) (কৌতুককর নাম), হুদহুদি (মেদিনীপুর : ঝাড়গ্রাম), হুড়হুড়া (মেদিনীপুর: খড়্গপুর), হুড়হুড়িয়া (মেদিনীপুর: চন্দ্রকোণা), হুড়ুহুড়ু (মেদিনীপুর: কেশিয়ারী)।

এ-তালিকায় ৭৬টি পৃথক্ নামের মোট ১১৯ টি গ্রামের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের জেলাওয়ারি ভাগ—মেদিনীপুর—৩৫, বাঁকুড়া—১৩, বীরভূম—১২, পুরুলিয়া ও ২৪-পরগণা—১১ ক'রে, পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহার—৮ হিসাবে, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও হুগলি—প্রতিক্ষেত্রে ৪, মালদহ ও দার্জিলিং উভয় জেলায়—৩, নদীয়া—২ এবং জলপাইগুড়ি—১। অর্থাৎ, যেখানে যেখানে আদিবাসীদের সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ, নামগুলি প্রধানতঃ সেইসব এলাকা থেকেই সংগৃহীত। তাদের গঠনে আদিবাসী ভাষার সম্পর্কও স্পষ্ট। দৃষ্টান্ত—ইন্দাবিন্দা, কেচকেচিয়া, কোলসোল, ডাংরাডাংরি, শিরুপাড়ু, সইলমইল, হুড়ুহুড়ু প্রভৃতি। সেজন্য, আলোচ্য শ্রেণীর গ্রাম-নামের উৎপত্তিতে আদিবাসী ভাষাগুলির প্রভাব কতখানি তা গভীরতরভাবে অনুসন্ধান-যোগ্য এক চিত্তাকর্ষক বিষয়।

'লক্ষ্মীপুরাণ' বনাম 'দ্বারিকা পালা'

ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা*

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের উড়িষ্যায় যে কবি-পঞ্চক কাব্য রচনা করে উড়িষ্যার ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন তাঁরা 'পঞ্চসখা' নামেই সুপরিচিত। এঁদের অন্যতম এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলরাম দাস (১৪৮৪—?) যাঁর 'জগমোহন রামায়ণ' অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। এঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য। রামায়ণ, বেদান্তসার, ভাবসমুদ্র এবং গুপ্তগীতা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এই সুকবি বলরাম দাস 'লক্ষ্মীপুরাণ' নামক একটি ক্ষুদ্রায়তন ব্রতকথাও রচনা করেছিলেন। লক্ষ্মীর ব্রতকথামূলক এই রচনাটি ওড়িয়া ভাষায় রচিত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রচনাগুলির অন্যতম।

অগ্রহায়ণ মাসের বৃহস্পতিবারগুলিতে হিন্দু মহিলারা এই ব্রত করে থাকেন। সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে প্রীত করাই এই ব্রতের উদ্দেশ্য। এই ব্রতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হোল ব্রতকথা শ্রবণ। হাতে ফুল নিয়ে অনন্যচিত্তে একই আসনে উপবিষ্ট থেকে ব্রতকথা শুনলে তবেই কাম্য ফললাভ সম্ভব। মনে হয় এই কারণেই ব্রতকথা-জাতীয় রচনাগুলি স্বল্পায়তন। দেবদেবীর স্তব, তাঁদের সেবায় অবহেলা ঘটলে দুর্ভাগ্যের পরিমাণ এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলে কী পরিমাণ সৌভাগ্যলাভ সম্ভব এই সব নিয়েই ব্রতকথাগুলি রচিত। শ্রদ্ধাহীন কোন ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করে দেখানো হয় পরে শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠার ফলে তার কতখানি সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। এই শ্রেণীর কাহিনীগুলি, স্বভাবতই মহিলাসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত থাকে।

বলরাম দাসের লক্ষ্মীপুরাণ শুরু হয়েছে সংস্কৃতে রচিত মহালক্ষ্মীর স্তব দিয়ে। এগারোটি শ্লোক বা বাইশটি ছত্রে নারদ ও পরাশর মুনিদ্বয়ের কথোপকথনের ভেতর দিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে।

নারদ আর পরাশর চলেছেন গ্রামের ভেতর দিয়ে। গ্রাম উৎসবমুখর। ধনী-নির্ধন সব্বাই দেবারাধনায় ব্যাপৃত। নারদ ঐ উৎসবের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলে, পরাশর জানালেন যে মর্তবাসী লক্ষ্মীর আরাধনা করছেন। এখানে লক্ষ্মী জগন্নাথ-পত্নী এবং বলরাম লক্ষ্মীর ভাসুর। লক্ষ্মী, জগন্নাথ আর বলরামকে নিয়ে বলরাম দাস যে কাহিনী রচনা করেছিলেন তার জনপ্রিয়তা অকল্পনীয়। এই কাহিনী নিয়ে রচিত বেতার-নাটকও প্রচারিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে।

লক্ষ্মীপুরাণের এই কাহিনী নিয়ে রচিত

---

* ভুবনেশ্বরে ভারত সরকারের রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশনের বাংলা বিভাগের প্রধান। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্বন্ধে গবেষণাপত্রের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পিএইচ ডি উপাধিতে ভূষিত। 'মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যধারায় উড়িষ্যার কবিদের অবদান' বিষয়ে গবেষণাপত্রের জন্য সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে ডি. লিট. উপাধি দিয়াছেন। বর্তমানে ওড়িয়া অক্ষরে লেখা বাংলা পুথি সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণাকার্যে নিযুক্ত। ইঁহার আবিষ্কৃত পুথিগুলি বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

বাংলাভাষায় একটি ক্ষুদ্রায়তন কাব্যের সন্ধান পেয়েছি। কাব্যটির রচয়িতা হিসেবে যে নামটি ভণিতায় ব্যবহৃত হয়েছে তা হোল ধনঞ্জয়। আমার অনুমান, ইনি কবিসম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জের পিতামহ ঘুমসর রাজ্যের তদানীন্তন রাজা ধনঞ্জয় ভঞ্জ (১৬১১-১৭০১) এবং সুপরিচিত 'রাঘববিলাস' ও 'রত্নমঞ্জরী' কাব্যদ্বয়ের রচয়িতা। এ দু'টি কাব্য কিন্তু এখনো পাণ্ডুলিপির আকারেই পুথিশালায় রক্ষিত আছে। ধনঞ্জয়ের 'দ্রৌপদী চন্দ্রোদয়', 'মদনমঞ্জরী', 'ইচ্ছাবতী' এবং 'অনঙ্গরেখা' কাব্যচতুষ্টয় মুদ্রিত হয়েছে। ধনঞ্জয়ের পুত্র নীলকণ্ঠেরও কবিখ্যাতি ছিল তবে তাঁর পৌত্র উপেন্দ্র ভঞ্জ ওড়িয়া কাব্যধারায় বিশিষ্ট অধ্যায়ের স্রষ্টা। বলা যায়, উপেন্দ্র ভঞ্জের ওপর পিতার চাইতে পিতামহের প্রভাবই ছিল অধিকতর। ওড়িয়া সাহিত্যের সমালোচকদের মতে উপেন্দ্র ভঞ্জের বিখ্যাত কাব্যদ্বয় 'বৈদেহীশবিলাস' এবং 'লাবণ্যবতী'-র মধ্যে পিতামহের কাব্যদ্বয় যথাক্রমে 'রাঘববিলাস' এবং 'রত্নমঞ্জরী'র প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

লক্ষ্মীপুরাণের কাহিনীটি গ্রহণ করে ধনঞ্জয় যে কাব্য রচনা করেছেন সেটি কিন্তু ব্রতকথার পর্যায়ে পড়ে না। অগ্রজের কাহিনীটিকে তিনি ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত করে অতিপরিচিত একটি লৌকিক বৃত্তের মধ্যে স্থাপন করেছেন। বলরাম দাসের জীবনাদর্শ এবং ধনঞ্জয় ভঞ্জের জীবনাদর্শের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। শুধু কাহিনীবিচারেই বলরামকে ধনঞ্জয়ের পূর্বসূরী বলতে হয় কিন্তু রচনাদর্শের বিচারে বলরাম ভক্তিমার্গে এবং ধনঞ্জয় যুক্তিমার্গে প্রতিষ্ঠিত। পূর্বসূরী ধর্মসচেতন কিন্তু উত্তরসূরী অত্যন্ত সমাজসচেতন। ফলে বলরাম দাসের কাহিনী ধনঞ্জয়ের কাছে এসে পৌরাণিক পরিমণ্ডল পরিত্যাগ করে প্রাকৃত সত্তা অর্জন করেছে। জগন্নাথ, বলরাম এবং লক্ষ্মী তাঁদের দৈবী স্বভাব বর্জন করে ধনঞ্জয়ের কাব্যটিতে সাধারণ নরনারীর রূপ পরিগ্রহ করেছেন। ধনঞ্জয় 'লক্ষ্মীপুরাণে'র কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন 'দারিকা পালা'। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

অগ্রহায়ণ মাসের এক বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী নগর (পুরী)-ভ্রমণে বেরিয়ে দেখলেন রত্নশ্রীপুরের কোন গৃহেই 'গোময়ের ছড়া ঝাঁট নাই'। এমনকি বিধবা ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী 'খইভাজা খাইতে বস্যাছে গুরুবারে'। ওর বাড়ীতে 'লক্ষমন সোনার ভাণ্ডার' ছিল তবু লক্ষ্মী শাপ দিলেন, 'দরিদ্র হইয়া মাগ্যা' খেতে হবে তাকে। এরপর 'লক্ষ্মীদেবী' গিয়ে পৌছলেন শ্রীয়া[১] চণ্ডালিনীর বাড়ীর সামনে। সে নারী কিন্তু কৃষ্ণার্পিতপ্রাণা। লক্ষ্মী কুবেরকে ডেকে আদেশ করলেন শ্রীয়াকে প্রচুর ধনসম্পদ দিতে।

এদিকে বলরাম বেরিয়েছিলেন নগর-ভ্রমণে। তিনি চণ্ডালিনীর বাড়ীতে লক্ষ্মীকে উপবিষ্টা দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সংসারের মান-সম্মান রক্ষায় দায়িত্ব তাঁরই। তিনি জগন্নাথকে সবকথা জানিয়ে আদেশ করলেন লক্ষ্মীকে বর্জন করতে। একথাও বলরাম জানালেন, লক্ষ্মীকে মন্দিরে স্থান দিলে তিনি রেবতীকে নিয়ে বাইরে চলে যাবেন। অগত্যা জগন্নাথকে লক্ষ্মীকেই পরিত্যাগ করতে হোল। লক্ষ্মী সমুদ্রের কূলে গিয়ে হনুমানের সাহায্যে সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং মন্দিরবাসী জগন্নাথ, বলরাম প্রভৃতিকে নিদ্রিত করিয়ে

১ 'শ্রীয়া' শব্দের অর্থ শ্রী-সম্পন্না।

মন্দিরের সমস্ত আসবাব এবং খাদ্যসামগ্রী বইয়ে আনালেন নিজের প্রাসাদে।

পরদিন প্রভাতে 'লক্ষ্মীছাড়া' ভায়েরা নিজেদের চরম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হলেন। ভিক্ষার সাহায্যে প্রাণধারণের সম্ভাবনাও রইল না। কারণ সাধারণ মানুষেরা চাল, পান, শাক, সিম দিলেও 'লক্ষ্মীর মায়ায় তার কিছু নাহি রহে।' নদীর তীরে পঞ্চানন তপস্যা করছেন। দুই ভাই গিয়ে পৌঁছলেন তাঁর কাছে কিছু খাদ্যের প্রত্যাশায় কিন্তু 'সদাশিব বলে মোর থালে কিছু নাই।' যাই হোক, তাঁরই উপদেশে দুই ভাই সমুদ্রের তীরে বসবাসকারী অনৈকা দানশীলা রমণীর গৃহে গিয়ে পৌঁছলেন। ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণদের রন্ধনের উপযোগী সমস্তপ্রকার সামগ্রী দাসী এনে দিল কিন্তু 'দুঃখ দিব দুইজনে, লক্ষ্মী বিচারিল মনে', অতএব উনুন জ্বালাই সম্ভব হোল না। বহু কষ্টে যদি চোখমুখ লাল করে আগুন জ্বাললেন বলরাম, 'আজ্ঞা দিল ঠাকুরাণী, যদি বা জ্বলিল অগ্নি, হাণ্ডি বিচুরিয়া গেল তার।'

কিছুতেই রান্না করা যখন সম্ভব হোল না তখন ক্ষুধার্ত ভ্রাতৃদ্বয় দাসীর মাধ্যমে কিছু খাদ্য প্রার্থনা করলেন। শুধু এই সুযোগটিরই প্রতীক্ষায় ছিলেন গৃহকর্ত্রী। তিনি—

* * *

'গঞ্জনা করিয়া কিছু বলে হুহাকারে॥
রান্ধিতে না পার অন্ন কি বল আমারে।
কেমনে খাইবে অন্ন চণ্ডালের ঘরে॥—
চণ্ডালের বাতাস লাগিছে যার গায়।
মনে বিচারিয়া দেখ তার জাতি যায়॥'

এর উত্তরে—

'বলরাম বলে তুমি শুনগো যুবতী।
অন্ন দিয়া রাখ প্রাণ কি করিবে জাতি॥'

এরপর কোন রমণীর পক্ষেই ক্ষুধার্তদের উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। রমণীটি স্বয়ং রান্না করে দুই ভাইকে খাওয়ালেন কিন্তু খাওয়ালেন ঠিক তেমনি সব খাদ্য যা এই দু'ভাই খেতে অভ্যস্ত। তাছাড়া খাদ্য পরিবেশনের সময় রমণীটির দু'টি পায়ে বিশেষ কোন চিহ্ন জগন্নাথ লক্ষ্য করলেন। উৎকণ্ঠায় অধীর জগন্নাথ প্রশ্ন করলেন—'কেবা তুমার মাতাপিতা কেবা তুমার পতি।' উত্তর শোনা গেল, 'জগন্নাথ পতি মোর সিন্ধু মাতাপিতা।' সব সংশয়ের নিরসন হোল। লক্ষ্মীকে নিয়ে বলরাম এবং জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে গেলেন। এইখানে উল্লেখ করতে হয় যে জগন্নাথ যখন ভৎসনা করে লক্ষ্মীকে মন্দির থেকে বার করে দিয়েছিলেন তখন কিন্তু তিনি বলেছিলেন—

'চণ্ডালিনী বলি মোরে বল প্রাণনাথ।
এই চণ্ডালিনী ঘরে মাগি খাবে ভাত॥'

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে লক্ষ্মীপুরাণের কাহিনীতে যে ধর্মীয় পরিমণ্ডল ছিল অনুজ কবি ধনঞ্জয় তাকে সযত্নে বর্জন করে তাঁর কাব্য 'দ্বারিকা পালাকে' সমকালীন সমাজের পটভূমিতে স্থাপন করেছিলেন। যৌথপরিবারে অগ্রজের আধিপত্য, জাতিভেদ আর স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের তীব্র বিচার, নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতার অভাব প্রভৃতি সামাজিক বৈশিষ্ট্য-গুলি ধনঞ্জয়ের কাব্যখানিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আরও একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে আপন স্ত্রীর বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে আলোচনা যে সঙ্গত নয়; স্ত্রীলোকের পক্ষে লোভ পরিহার করা, অন্তঃপুরের শুচিতা এবং সেই সঙ্গে আপন চারিত্রিক শালীনতা রক্ষা করা প্রভৃতি যে কর্তব্য এ সব কথা কাব্যটির মধ্যে নানাভাবে নানা সময় উক্ত হয়েছে। আবার তারই পাশাপাশি জাত-পাতের বিচারটি যে বড়

কথা নয় এবং নারী বিবাহিতা হলেও তার মর্যাদা এবং স্বাধীনতাবোধ যে ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া উচিত নয় এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা রয়েছে।

প্রসঙ্গত পুনরায় স্মরণীয় যে ধনঞ্জয় ছিলেন সপ্তদশ শতকের মানুষ। সাধারণভাবে নারীর পৃথক্ সত্তা উনিশ শতকের আগে আমাদের সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেনি। এই শতকের মধ্যভাগে (১৮৫৪-৫৫) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন হিন্দু বালিকা-বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় যুক্তি উত্থাপন করে প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি প্রকাশ করেন তখনো সমকালীন সমাজপতিরা প্রবলভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের বিরোধিতা করেছেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর 'বন্ধু-বিয়োগ' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানির প্রথম সর্গেরই এক জায়গায় তাৎকালিক মেয়েদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

'অনায়াসে দুরাত্মাপুত্র গৃহে স্থান পায়,
পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্তু কন্যা ভেসে যায়।'

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে যখন নারী সম্পর্কে এই ধারণার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তখন সপ্তদশ শতকের অন্ত্যপর্বে ধনঞ্জয় ভক্তের কাব্যে নারীর স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা ঘোষণা অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বলরাম দাসের লক্ষ্মীপুরাণে যে বৈচিত্র্য বীজের আকারে উপ্ত হয়েছিল পরবর্তী শতকে ধনঞ্জয়ের কাব্যে তাকেই পত্র-পুষ্পে সুশোভিত দেখা গেল। বলরাম দাসের ব্রতকথাটিতে লক্ষ্মীব্রতের সুফল ও ব্রতোদ্যাপন না করলে তার কুফল বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে আর কাহিনীর প্রয়োজনে আনীত চরিত্রগুলি ধর্মীয় বর্ণাভায় মণ্ডিত হয়েছে। বলরাম দাস মূলতঃ ভক্তকবি কিন্তু ধনঞ্জয় ভক্ত শুধুমাত্র কবি। তাঁর কাব্যে কাহিনীটি লৌকিক রূপ পরিগ্রহ করে রমণীয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য চরিত্রগুলি দেবদেবী বলে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে কিন্তু তাতেও কাহিনীর এই প্রাকৃত সত্তাটি ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাছাড়া বলরাম ও জগন্নাথের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে নগর পরিক্রমা, রান্না করতে বসে তাঁদের ব্যর্থতা যথেষ্ট পরিমাণে হাস্যরসের খোরাক যুগিয়েছে। ফলে 'লক্ষ্মীপুরাণ' থেকে অবতরণ করে ক্রমে ঐ কাহিনীটিই 'দ্বারিকা পালা'র কাব্যগুণান্বিত হয়ে উঠেছে।

লোকায়ত সমাজে বিভিন্ন ব্রত যথেষ্ট নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালিত হলেও, ব্রতকথাগুলি কখনোই সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়নি। নাম 'লক্ষ্মীপুরাণ' হলেও স্মৃতি-পুরাণবহির্ভূত এই ধরনের ব্রতগুলি ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-চিহ্নিত কামনামূলক ক্রিয়াকলাপ এবং এগুলির আবেদন সর্বাপেক্ষা মহিলা সম্প্রদায়ের কাছেই বেশী। এগুলির কাহিনী পরিকল্পনার মধ্যে বাংলা মঙ্গলকাব্যের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কালিকা, চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, শনি, লক্ষ্মী, শীতলা এবং বাসুলী প্রভৃতি দেবদেবীর পাঁচালী ও ব্রতকথা প্রাক্-উনিশ শতকে বঙ্গদেশেও প্রচুর সংখ্যায় লিখিত ও প্রচারিত হয়েছিল। পরবর্তী কালের সমাজজটিলতা ও মনোধর্মের পরিবর্তন কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন বিষয়বস্তু ও নতুন আঙ্গিকের আবিষ্কার ঘটিয়েছে। গ্রামীণ ধর্মচেতনার দর্পণ এই ব্রতকথা-কাব্যগুলির মধ্যেও বিশ্লেষণ ও উপভোগের উপযুক্ত বিষয় আছে।

বাংলাসাহিত্যে লক্ষ্মীমঙ্গল বা লক্ষ্মীচরিত্র রচয়িতা-হিসেবে শিবানন্দ কর, দ্বিজপঞ্চানন, ভরতপণ্ডিত প্রভৃতির নাম ডঃ সুকুমার সেন

তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (পৃঃ ৪৪০-৪১, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উৎকলীয় কবিদের রচিত বাংলা কাব্য-কবিতার সন্ধান ছিল অজ্ঞাত। সেই সন্ধান পাওয়া গেছে শতাধিক পুথির মধ্যে এবং সাম্প্রতিক কালে সেইগুলি সাহিত্যরসিক সমাজে প্রচারের জন্মে চেষ্টা চলেছে। ষোড়শ থেকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এই কাব্য-কবিতাগুলির ভাষা বাংলা হলেও লিপি-রূপ ওড়িয়া। উৎকল-বঙ্গ সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত ঐ সব উৎকলীয় কবিদের বাংলাভাষা-জ্ঞানই শুধু যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তা নয়, মাতৃভাষা নয় এমন একটি ভিন্ন ভাষার অনুশীলন এবং তারই সাহায্যে কাব্য রচনা করে উৎকলবাসীদের সঙ্গে বঙ্গীয় সংস্কৃতির পরিচয় গভীরতর করে তোলার প্রচেষ্টাটিও সম্রদ্ধ স্মরণীয় ঘটনা। যে কাব্যগুলি নিয়ে সম্প্রতি কাজ করছি লক্ষীপুরাণাশ্রিত কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রসাশ্রিত কাব্য খারিকা পালা সেগুলির অন্যতম।

মোরভিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রামকৃষ্ণ মঠের সেবাকার্য

রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ব্যোমানন্দ প্রদত্ত বিবরণ। স্বামী অচ্যুতানন্দ কর্তৃক অনুলিখিত।—সম্পাদক।

বৃষ্টি—বৃষ্টি—বৃষ্টি। ক'দিন ধরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। গত ১০ই ও ১১ই অগস্ট (১৯৭৯) রাজকোট ও আশপাশের অঞ্চলে চব্বিশ ঘণ্টায় একুশ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে। রাজকোটে বহুকাল এমন বর্ষণের কথা শোনা যায়নি। ঘর থেকে বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না। রাস্তা-ঘাট জলে জলময়। এর মধ্যে খবর পেলাম রাজকোট থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে সোমনাথের পথে জেতপুর গ্রামটি বৃষ্টির জলে জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে। খবরটা শোনার পর থেকেই আমরা আশ্রমেই পাঁচ হাজার খাবারের প্যাকেট তৈরী করে রেখেছিলাম, যে কোন মুহূর্তেই ত্রাণের কাজে বেরিয়ে পড়ার জন্ত প্রস্তুত হয়েও ছিলাম।

১২ই অগস্ট বেলা বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট নাগাদ আমরা খবর পেলাম, রাজকোট থেকে আটষট্টি কিলোমিটার দূরের দু-নম্বর মাচ্ছু বাঁধটি প্রচণ্ড জলের চাপে আগের দিন ভেঙেগিয়েছে, মোরভি শহর জলমগ্ন এবং বাঁধের জল প্রায় পনেরো ফুট উঁচু প্রবল স্রোতের তোড়ে আশপাশের একত্রিশটি গ্রামের সমস্ত কাঁচা বাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে। পাকা বাড়ি ও ধনসম্পত্তিরও সমূহ ক্ষতি হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়েছে—গৃহপালিত জীবজন্তর তো হিসেব নেওয়াই অসম্ভব। তাছাড়া সংলগ্ন আরও বোলটি গ্রামেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সংবাদ পাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা তিনজন সন্ন্যাসী পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে একটি বাস, একটি জীপ ও একটি পিকআপ ভ্যান-এ আগেকার তৈরী করে রাখা ঐ পাঁচ হাজার খাবারের প্যাকেট ও

আরও কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, যা আমাদের কাছে ছিল নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হই। রাস্তা মাত্র আটষট্টি কিলোমিটার। মোরভি শহরের পথ পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত হওয়ায় অত্যন্ত দুর্গম হয়ে পড়েছিল। যতদূর গাড়ি যায় যাওয়ার পর আমরা সরকারী কর্মীদের সহায়তায় হেঁটে জল-কাদা ভেঙে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে পৌছাই। যাওয়ার পথে যে দৃশ্য দেখেছি তার বর্ণনা দিতেও গা শিউরে উঠছে। পথের দুধারে যেসব বাড়িঘর তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, সেগুলির ছাদে, গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে, এমনকি টেলিফোনের পোস্টে তারের সঙ্গে আটকে ঝুলছে বহু শিশু, নারী ও পুরুষের মৃতদেহ। সে এক বীভৎস দৃশ্য! চারিধারে অসংখ্য শবদেহ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের তারই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে তাঁদের কাছে যাঁরা তখনও প্রাণে বেঁচে আছেন দারুণ আতঙ্কের মধ্যে নিদারুণ বিপর্যয়ের সাক্ষী হিসেবে। আমরা তাঁদের খুঁজে বের করে খাবারের প্যাকেট তুলে দিয়েছি তাঁদের হাতে। পাঁচ হাজার প্যাকেট নিঃশেষ হয়েছে অল্পক্ষণের মধ্যেই। প্রত্যেকটি প্যাকেটে ছিল ৮।১০টি পুরি আর তরকারি। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে মধ্যবিত্ত ও বনেদী ঘরের মানুষেরাও আজ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাদের ঐ খাদ্য গ্রহণ করেছেন অসংকোচে। কারণ সেদিন তাঁদের ঘরে এককণাও খাবার ছিল না। আমরা ঐ দিন আশ্রমে ফিরে আসি রাত্রি সাড়ে দশটায়।

আমাদের ঐ বন্যাত্রাণের বিবরণ বেলুড় মঠে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিই। এদিকে রাজকোটের আকাশবাণী থেকে রাত দশটা পঞ্চাশ মিনিটে বিশেষ সংবাদ বুলেটিনে বন্যার সংবাদ এবং প্রথম স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সঙ্গে রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমের সেবার কথাও প্রচারিত হয়। আর তার পনেরো মিনিটের মধ্যেই দলে-দলে স্থানীয় লোকেরা আমাদের আশ্রমে আসতে আরম্ভ করেন সেবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও অর্থ নিয়ে। প্রতিশ্রুতিও দেন তাঁরা অর্থ ও সামগ্রী দিয়ে সহায়তার। এঁরা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় তিন-চার শত। রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত এই জনস্রোত অবিরাম চলে। এরই মধ্যে আমরা পরদিনের কাজের ছক করে ফেলি আর প্রায় কুড়ি হাজার খাবারের প্যাকেটও তৈরী করে ফেলি।

পরদিন ১৩ই অগস্ট সকাল প্রায় আটটায় আমরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে বাস, জীপ ইত্যাদিতে ঐ কুড়ি হাজার খাবারের প্যাকেট নিয়ে মোরভি শহরে পৌছাই। তখন সেখানে দুর্গতদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমরা সেখানেই তাঁদের ঐ খাবার দিয়ে দিলাম। পথে আমাদের একটা বাস দুর্ঘটনায় পড়ে, অথচ এমনি ঠাকুরের করুণা কোন সেবাব্রতীরই বিন্দুমাত্র আঘাত লাগেনি। আমরা আবার অন্য গাড়ী সংগ্রহ করে এগিয়ে যাই।

এইখানেই আমরা শুনি এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। মাচ্ছু বাঁধটির ঠিক নীচে যে গ্রাম তার নাম লীলাপুর। সেখানে দুশোটি বাড়ি ছিল। সেই গ্রামের একটি পিওনের ছেলে বাঁধের ওপর বেড়াতে বেড়াতে দু-একটা ফাটল দেখে গ্রামের লোকদের বলে। সেই কথা শুনে মাত্র বিশ-ত্রিশ জন ছাড়া আর সকলেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়, কিন্তু ঘরবাড়ির মায়া কাটাতে না পেরে ঐ যে ক'জন থেকে যায়, তারা চিরকালের জন্যই জলের তলায় তলিয়ে যায়। ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে আমরা

মোবভি : বন্যাব করাল গ্রাসে

মোরভি : বন্যার পর ধ্বংসাবশেষ

দরদরান্তরে ত্রাণকার্য

গ্রামে গ্রামে নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণে রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম

লীলাপুর গ্রামে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর প্রাণরক্ষা

দেখেছি—যার কথায় এতগুলো মানুষ বেঁচে গিয়েছে। আমরা ঐ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামটিতেও গিয়েছি। সেখানে যে-সব পরিবার উঁচুতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাসনপত্র, বিছানা, জামা-কাপড়, লণ্ঠন, খাবার জিনিস—সব মিলিয়ে ত্রিশ রকমের সামগ্রী আমরা বিতরণ করেছি। সাত-আট দিনের মত খাবার তাঁদের দেওয়া হয়েছিল।

১৪ই অগস্ট থেকে সরকারী পরিচালনায় রাজকোট শহরে ত্রিশটি উদ্বাস্তু-ত্রাণশিবির খোলা হয়। সেখানেও আমরা তেরো হাজার শরণার্থীদের মধ্যে খাবারের প্যাকেট বিতরণ করেছি। আগের মতোই প্রত্যেকটি প্যাকেটে ৮।১০টা পুরি ও তরকারি ছিল। তাছাড়া এঁদের বিছানার চাদর, ধুতি, শাড়ি, জামা-কাপড়, কম্বল, ঔষধপত্র, এবং নানারকমের ঐ-দেশী খাবার দিয়েও সেবা করেছি।

ঐদিন থেকেই সরকারী ব্যবস্থায় হেলিকপটারে করে আমাদের আশ্রমে তৈরী খাবারের প্যাকেট জলবন্দী গ্রাম মালিয়া ও আশপাশের গ্রামগুলিতে যায়। পাঁচ-ছয়শো প্যাকেট আমরা ঐ অঞ্চলে আকাশ থেকে দুর্গতদের দিতে পেরেছি। প্রতিটি প্যাকেটের ওজন প্রায় আট-দশ কেজির মত। তাতে চাল, গম, বাজরা, রান্নাকরা খাবার, ওষুধপত্র, জামাকাপড়—এই সব ছিল।

এরপর আমরা ১৪ই থেকে ২০শে অগস্ট পর্যন্ত সাতদিন আরও ভেতরের ষোলটি গ্রামে কাজ করেছি। যাওয়া আসায় দশ মাইল হাঁটাপথে গিয়ে আমরা সরেজমিনে সব দেখে মালিয়া ও এইসব গ্রামের বন্যাদুর্গতদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যাদি বিতরণ করেছি।

এই সব সেবাকাজ ছাড়াও শত শত নর-নারী যাঁরা বন্যায় প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁদের স্তূপীকৃত মৃতদেহের দাহকার্যেও আমরা অংশ-গ্রহণ করেছি। সে দৃশ্য বড়ই করুণ।

আমাদের প্রধান শিবির হয়েছে মোরভি শহরে। বেলুড় মঠ থেকেও সন্ন্যাসী-কর্মী এসে সেখানে সেবার কাজে লেগেছেন।

এ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠের পক্ষ থেকে সেখানে আমরা প্রায় আট লক্ষ টাকার কাজ করেছি। প্রায় একলক্ষ-দশহাজার-সাতশো-পঞ্চাশটি খাদ্যপ্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। অন্যান্য সামগ্রী যা বিতরণ করা হয়েছে, তা হ'ল উনত্রিশ হাজার ছশো কেজি চাল-গম-বাজরা, দু'হাজার সাড়ে চারশো কেজি আটা, দু'হাজার কেজি আলু, একহাজার কেজি চিনি, বেসন, চা, ঘি ইত্যাদি, শিশুদের খাদ্য তিনশো টিন, ধুতি-শাড়ি সাড়ে তেইশ হাজারটি, শিশুদের জামাকাপড় প্রায় ৭০০টি, তিনহাজার একশো পঁচিশটি রান্নার ও প্রয়োজনীয় বাসনপত্র। এ-ছাড়া বিছানার চাদর, কম্বল, হ্যারিকেন লণ্ঠন, সাবান, মোমবাতি, দেশলাই, মাদুর, চিরুনি ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সাধারণ নাগরিক ও বিশিষ্ট শিল্পপতিরা আমাদের এই সেবাব্রতে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করছেন এবং আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসছে। এই চলতি সেবাকাজ ছাড়াও আমরা ভবিষ্যতে দুঃস্থদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাড়ি তৈরী করে দেওয়ার প্রকল্পও গ্রহণ করেছি এবং তা বেলুড় মঠের অনুমোদন লাভ করেছে। আশা আছে, এই সব গৃহহারা ছিন্নমূল মানুষ পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং নতুন করে তাদের ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারবে।

জন্‌ডিস

ডক্টর জলধিকুমার সরকার*

জন্‌ডিস (Jaundice) বা ন্যাবা, যেটি অনেক সময় খবরের কাগজে 'হেপাটাইটিস' (Hepatitis) রোগ-বলে বর্ণিত হয়, সেটি মূলতঃ লিভার (Liver) বা যকৃতের অসুখ। 'হেপাটাইটিস' কথাটির অর্থ যকৃতের প্রদাহ।

ব্যাপারটি একটু তলিয়ে দেখা যাক। আমাদের রক্তে বিলিরুবিন (Bilirubin) নামক একটি হরিদ্রাভ পদার্থ আছে, যার পরিমাণ শতকরা ০'৫—০'৮ ভাগ (অর্থাৎ ১০০ মিলিলিটার রক্তে ০'৫—০'৮ মিলিগ্রাম)। রক্তে এর পরিমাণ যদি দুই বা তিন শতাংশের বেশী হয়, তাহলে চোখ বা গায়ের চামড়া হলদে দেখায়, প্রস্রাব হলদে হয়, এবং আমরা তখন 'জন্‌ডিস হয়েছে' বলি। রক্তে বিলিরুবিন কোথা হতে আসে? আপনারা জানেন যে, রক্তের মধ্যে লাল রক্তকণিকা (Red blood cell or R. B. C.) প্রবাহিত হয়, যেগুলি তাদের ভিতরের হিমোগ্লোবিন (Hæmoglobin)-এর সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন (Oxygen) সরবরাহ করে। এই রক্তকণিকাগুলির আয়ু ১২০ দিন এবং আয়ুশেষে প্লীহায় (Spleen) বা শরীরের অন্য স্থানে ছড়িয়ে-থাকা বিশেষ ধরনের কোষ (Reticulo-endothelial cell or R. E. Cell) রক্তকণিকাগুলিকে ধ্বংস করে। এই ধ্বংসের ফলে রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন ভেঙে গিয়ে বিলিরুবিন নামক পদার্থ-বার হয়। বিলিরুবিন রক্তের মাধ্যমে লিভারে পৌঁছুলে, লিভারের কোষগুলি (Cell) এটিকে কিছুটা পরিবর্তন (Conjugation) করে পিত্তাংশ হিসাবে যকৃতের ছোট্ট ছোট নালি (Caneliculi) দিয়ে একে যকৃতের তলদেশস্থিত পিত্তস্থলীতে (Gall-bladder) পাঠায়। সেখান হতে অন্য একটি বড় নালি (Bile Duct) দিয়ে সেই পিত্ত অন্ত্রে গিয়ে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশে হজমে সাহায্য করে। অন্ত্রের মধ্যে পিত্তের খানিকটা অংশ দাস্তের সঙ্গে বার হয়ে যায়, যার জন্য দাস্তের রঙ হলদে হয়। বাকিটা রক্তের মধ্যে ঢুকে কিছুটা প্রস্রাবের সঙ্গে বার হয়, এবং কিছুটা যকৃতে ফিরে গিয়ে পিত্ত তৈরী করতে সাহায্য করে। এই হলো বিলিরুবিনের বিবর্তনের ইতিহাস। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ প্রধানতঃ নির্ভর করছে লিভারের সুস্থ থাকার উপর, অর্থাৎ লিভারের কোষগুলির কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকার উপর। অবশ্য বিলিরুবিনের উপরি-উক্ত গতিপথ হতে এটাও বুঝা যায় যে লিভারের দোষ ছাড়া অন্য কারণেও রক্তে বিলিরুবিন বাড়তে পারে। মোটামুটিভাবে জন্‌ডিসকে নিম্নলিখিত তিনভাগে ভাগ করা হয়:

(১) বিলিরুবিনের গতিপথে বাধা-জনিত (obstructive) জন্‌ডিস—যেমন

---

* কলিকাতা স্কুল অ। ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরলজির ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট। এম. এস. এ।

পিত্তথলীতে পাথুরি হলে বা লিভারে টিউমার বা ক্যানসার (tumour বা cancer) হলে।

(২) অধিকপরিমাণে রক্তকণিকাক্ষয়-জনিত (haemolytic) জনডিস—যেমন সর্পদংশনের ফলে বা শরীরের মধ্যে কোন স্থানে অত্য রক্তক্ষরণ হলে।

(৩) ভাইরাস (virus বা জীব-পরমাণু) বা ব্যাকটিরিয়া (Bacteria বা জীবাণু) দ্বারা আক্রমণের ফলে ইনফেকসাস (Infectious) জনডিস। এক্ষেত্রে লিভারের কোষগুলি ঠিকমত কাজ করতে পারে না।

এছাড়া কতকগুলি ঔষধের বিষক্রিয়া, বিশেষ রকমের রক্তাল্পতা (Pernicious anaemia) প্রভৃতি আরও কয়েকটি কারণ আছে জনডিসের। তবে ভাইরাস-জনিত জনডিসই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়। এটি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত : ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস (Infective hepatitis) ও সিরাম হেপাটাইটিস (Serum hepatitis)।

ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস

বহুসংখ্যক লোক যখন জনডিস রোগে আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ রোগটি যখন মড়ক আকারে দেখা দেয়, তখন ধরে নিতে পারা যায় যে এদের ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস হয়েছে, যার মূলে আছে এক রকমের ভাইরাস, 'ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস ভাইরাস' (I. H. virus অথবা virus A)। মনে হয় 'ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস' হতে 'হেপাটাইটিস' কথাটি তুলে নিয়ে খবরের কাগজে 'হেপাটাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব' এই শিরোনামায় অনেক সময় খবর বার হয়। ভাইরাস-আক্রান্ত হয়ে রক্তের কোষগুলি বিলিরুবিনকে যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না বলে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ বেড়ে যায়—এমন কি ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। মানুষের শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশ করে প্রধানতঃ পানীয় বা খাদ্যের মাধ্যমে, তবে দূষিত (অর্থাৎ ভাইরাস-মিশ্রিত) পানীয় জলই এই অসুখের সবচেয়ে বড় কারণ। ১৯৫১ সালে পানীয় জল দূষিত হয়ে দিল্লীতে ৩০,০০০ লোকের এই ধরনের জনডিস হয়েছিল। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, বাড়ীতে একই জল পান করা সত্ত্বেও বাড়ীর সকলের এই অসুখ হয় না কেন? এর উত্তর এই যে ভাইরাস কারও শরীরের মধ্যে ঢোকার পরে তার অসুখ হওয়া-না-হওয়া নির্ভর করে তার রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতার উপরে। অনেকের শরীরে কম পরিমাণে এই ভাইরাস ঢুকে অসুখের সৃষ্টি না করে রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা তৈরী করে, ফলে তারা ভবিষ্যতে সেই ভাইরাসের আক্রমণ হতে রেহাই পায়। রোগীর পায়খানা, প্রস্রাব, থুতু, বিশেষতঃ পায়খানার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাস নির্গত হয়ে পানীয় জলকে দূষিত করতে পারে। জনডিস দেখা দিবার দুই সপ্তাহ আগে হতে পায়খানার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাস বার হতে থাকে এবং জনডিস দেখা দিবার পর এর নির্গমন কমে যায়।[১] পানীয় জলের নলে ফুটো থাকলে ড্রেন হতে ময়লা জলের সঙ্গে এই ভাইরাস পানীয় জলে মিশে যেতে পারে। অবশ্য নদীর জল বা অশোধিত কলের জল যারা ব্যবহার করে তারা যে-কোন সময় ওই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

শরীরে এই ভাইরাস ঢোকার ১৫ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয়।[১] প্রথমে ক্ষুধামান্দ্য, গা বমির ভাব, দুর্বলতা, কোষ্ঠবদ্ধতা

বা মাথাধরা থাকে। পরে পেটে অস্বস্তি, সামান্য জ্বর, চোখ হলদে ও হলুদ রঙের প্রস্রাব হয়। নাড়ীর গতি মন্থর হয় ও লিভার বড় হয়। অসুখ সম্পূর্ণ ভাল হতে মাসখানেক সময় লাগতে পারে। তবে অসুখ সাংঘাতিক ধরনের হলে, লিভারের অনেক কোষ নষ্ট হয়ে যায়, রোগী ভুল বকে এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে তার মৃত্যুও হতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে এই অসুখে মৃত্যুর হার কম, শতকরা একের বেশী নয়। কিছু সংখ্যক লোকের, বিশেষতঃ শিশুদের, চোখ বা চামড়া হলদে না হয়েও এই অসুখ হতে পারে।

বৎসরের সব সময়েই এই অসুখ হতে পারে, তবে বর্ষার প্রারম্ভে এর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই এই রোগ বর্তমান, তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বেশী। ল্যাবরেটরিতে চাষ (culture) করে এই ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি বা কোন জন্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে তাকে এই রোগে আক্রান্ত করা যায়নি আজ পর্যন্ত। তবে মার্মোসেট (Marmoset) নামের জন্তুকে এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে সম্প্রতি দাবি করা হয়েছে।[৪] রোগের লক্ষণ মিলিয়ে এবং রক্তে বিলিরুবিনের ও অন্যান্য এনজাইমের (Enzymes : Transaminase, dehydrogenase ও phosphatase) পরিমাণ দেখে রোগ-নির্ণয় করা হয়।[২]

এটি ভাইরাস-জনিত অসুখ বলে এর সোজাসুজি কোন চিকিৎসা নেই, যাতে করে ভাইরাসগুলিকে মেরে ফেলা যায়। তবে যতদিন পর্যন্ত রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ দুই শতাংশের নীচে না নামে ততদিন রোগীর বিশ্রাম লওয়া উচিত। খাদ্য লঘুপাক হওয়া দরকার এবং তৈলাক্ত ও চর্বি-জাতীয় খাদ্য খাওয়া বারণ। শর্করাজাতীয় খাদ্য লিভারের পুনর্গঠনে সাহায্য করে। একবার অসুখ হলে রোগীর প্রতিরোধ-ক্ষমতা জন্মে, যাতে করে তার আর দ্বিতীয়বার এই অসুখ দেখা যায় না।[১] কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত যে, রোগমুক্ত হওয়ার কয়েকবৎসর পরে কারও কারও লিভারে 'সিরোসিস' (cirrhosis) নামক রোগ হতে পারে। বয়স্ক রোগীদের জনডিস দেখা গেলে ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার, রোগটি ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস কিংবা লিভারে ক্যানসার রোগের সূচনা, এটি জানবার জন্যে।

এই রোগের প্রাদুর্ভাব হলে কতকগুলি ব্যবস্থা লওয়া উচিত। অন্যান্য ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস জলে সাধারণ মাত্রার ক্লোরিনে (one part per million) ধ্বংস হয়ে যায়—কিন্তু এই ভাইরাসকে মারতে হলে জলে ক্লোরিনের মাত্রা এত বাড়াতে হবে যে, তা নানা কারণে সম্ভব হয় না। সেইজন্য জল ফুটিয়ে খাওয়াই নিরাপদ। রোগীর মলমূত্র যাতে পানীয় জলে না মিশে বা তাতে মাছি না বসে তা দেখা উচিত। গ্লোবিউলিন (Pooled serum globulin কিংবা Immune gamma globulin) ইনজেকসন নিলে সুস্থ লোক মাস ছয়েক এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে বলে অনেক পাশ্চাত্যদেশীয় ভ্রমণকারী গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসবার আগে এই ইনজেকসন নেন।

সিরাম হেপাটাইটিস

ভাইরাস-জনিত জনডিসের অপর ভাইরাসের নাম 'সিরাম হেপাটাইটিস ভাইরাস' (Serum hepatitis virus or S. H. virus or virus B)। এই ভাইরাস অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের রক্তে প্রথমে পাওয়া যায় বলে এর

অপর নাম 'অস্ট্রেলিয়া এ্যান্টিজেন' (Australia Antigen)। এটি সাধারণতঃ ইনজেকসনের সূচের মাধ্যমে একের রক্ত হতে অন্যের রক্তে প্রবেশ করে, যদি ব্যবহৃত সূচ ভাল করে ফুটান না হয়। কেবল স্পিরিট দিয়ে মুছলে এই ভাইরাস মরে না। ভাইরাস শরীরে ঢোকার দুই থেকে তিন মাস পরে এই রোগের সূচনা হয়। এই ভাইরাসও লিভারের কোষকে আক্রমণ করে জন্ডিস সৃষ্টি করে এবং রক্তে প্রায় একই রকমের দোষ পাওয়া যায়। তবে জ্বর বিশেষ হয় না। আরোগ্য লাভের পরেও শতকরা দশজন রোগীর[১] রক্তে এই ভাইরাস পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাঁরা দীর্ঘকাল-স্থায়ী ভাইরাসবাহী (chronic carrier) হন; কিন্তু ইনফেকটিভ হেপাটাইটিসে এরকম হয় না। এইজন্য রক্তদানকারী (Blood donor)দের রক্ত প্রথমে পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে তাঁদের রক্তে সিরাম হেপাটাইটিস ভাইরাস আছে কি না। তা না করলে রক্ত-গ্রহণকারীর জন্ডিস হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই ভাইরাসকেও ল্যাবরেটরিতে চাষ করা বা এর দ্বারা অন্য জন্তুকে আক্রান্ত করা সম্ভব হয় নি, যদিও সিম্পাঞ্জিকে (Chimpanjee) আক্রান্ত করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।[১] গ্লোবিউলিন ইনজেকসন দ্বারা এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তবে রোগীর রক্ত থেকে ভাইরাসগুলিকে আলাদা করে তা থেকে প্রতিরোধক টিকা তৈরীর চেষ্টা চলছে। আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ অথচ রক্তে ভাইরাসবাহীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে।[২] মনে হয় এটি অধিকসংখ্যক লোকের মর্ফিয়া-জাতীয় ইনজেকসনে অভ্যস্ত (Drug addict) হওয়ার ফল। অনেকে মনে করেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পোকামাকড়ের কামড়ের ফলেও এক হ'তে অন্যের রক্তের মধ্যে এই ভাইরাস চলে যাচ্ছে। আফ্রিকায় এক হ'তে ছয় শতাংশ অধিবাসীর ও ভারতবর্ষে শূন্য হ'তে ২'৫ শতাংশ অধিবাসীর রক্তে এই ভাইরাস পাওয়া যায়।[৩] বর্তমানে এই ভাইরাস নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে।

উপরি-উক্ত দুটি ভাইরাস ছাড়া আরও কয়েক রকমের ভাইরাস জন্ডিস করতে পারে, কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস বৃহৎ সমস্যারূপে দেখা দেয় বলে এই প্রবন্ধে এটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে মড়ক আকারে দেখা না দিয়ে যদি বিক্ষিপ্ত-ভাবে একজন দুজন জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হন, ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস ও সিরাম হেপাটাইটিস—দুটির সম্ভাবনাই চিন্তা করতে হবে। ল্যাবরেটরির সাহায্য ব্যতীত অনেক সময় তফাৎ করা মুস্কিল হয়ে পড়ে।

আকর-নির্দেশিকা

১ Hepatitis Surveillance, Centre for Disease Control, U. S. A., Report No. 42, June 1978, pp. 27-28.

২ World Health Organisation, VIR/75.9, 1975, p. 21.

৩ Transaction of the Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene, 65, 1971, p. S. 77.

সমালোচনা

উপনিষদ্ সাহিত্য: স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। প্রকাশক: ডাঃ বি. কে. গাঙ্গুলী, ৩৫ বাদুড় বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। (১৩৮৪), পৃ: ২২৯, মূল্য: দশ টাকা।

শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্: সম্পাদক: স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। (১৩৮৪), পৃ: ৫৩, মূল্য: দুই টাকা।

অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রে স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর 'উপনিষদ সাহিত্য' (প্রথম খণ্ড) নিঃসন্দেহে একটি অমূল্য অবদান। তাঁর সুলিখিত গ্রন্থখানি একটি বহু অনুভূত অভাব পূরণ করেছে। উপনিষদের দুরূহ তত্ত্বগুলি বুঝতে হলে যে বিষয়গুলির অনুধাবন সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেগুলিকে স্বামীজী সমগ্র উপনিষৎ-শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে যথাসম্ভব ক্রম অনুসারে সুমিত, সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আগাগোড়া গল্পের আকারে উপনিষদ্ বলে যান নি তিনি, ইতঃপূর্বে কোন কোন লেখক যেমন করেছেন। এটি তাঁর আলোচনার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি যে-পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছেন সেইটিই মনে হয় সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপনিষদ্-সাহিত্যে প্রবেশের সমীচীন সরণি। এই গ্রন্থ পাঠ করলে দুরূহ টীকা-টিপ্পনী ছাড়াই পাঠক অনায়াসে মূলগ্রন্থে প্রবেশ করতে পারবেন। মূলগ্রন্থপাঠের প্রাথমিক বাধা লেখক সুনির্দিষ্টভাবে একে একে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন, যেমন করে কোন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ সরিয়ে ফেলে একে-একে বাধাদানকারী শিলাখণ্ডগুলিকে প্রাণবন্ত পার্বত্যনির্ঝরের গতিপথ থেকে এবং স্বচ্ছন্দ করে দেয় তার অগ্রগতিকে। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে মনীষী অনির্বাণ মন্তব্য করেছেন: 'বাহুল্যের মধ্যে না গিয়ে উপনিষদের মূল তত্ত্বগুলি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করায় বইখানি সুখপাঠ্য হয়েছে। অধ্যাত্মপথের পথিকদের কাজে লাগবে।' সুতরাং বলা বাহুল্য, গ্রন্থটি আমাদের প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না।

সরল-ভাবার্থ-সহ 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্' গ্রন্থটিতে স্বামীজী মহিম্নঃ স্তবের ভাবার্থ-বিন্যাসেও নিপুণ বৈদগ্ধ্য ও মর্মগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনা বহুজনহিতায়,—যিনিই পাঠ করবেন তিনিই উপকৃত হবেন।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ত্রিপাঠী
অধ্যাপক
রাজা পিয়ারীমোহন কলেজ,
উত্তরপাড়া (জেলা হুগলি)

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে বন্যাত্রাণ:

(ক) ১১ই অগস্ট ১৯৭৯ গুজরাতের রাজকোট জেলার মোরভি শহরের কিছুদূরে বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ায় ঐ শহর ও পার্শ্ববর্তী বহু গ্রাম প্রবল বন্যায় প্লাবিত হয়। বন্যার তাণ্ডবে অসংখ্য মানুষ ও গবাদি পশু বিনষ্ট হয়, বহু ঘরবাড়িও বিধ্বস্ত হয়। ১২ই অগস্ট

রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম ত্রাণকার্য শুরু করে। বিস্তারিত বিবরণ এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'মোরভিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রামকৃষ্ণ মঠের সেবাকার্য' শীর্ষক নিবন্ধে (পৃ: ৫১৫) দ্রষ্টব্য।

(খ) পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার দিঘড়া গ্রামে দুই জায়গায় ৭২টি গৃহের নির্মাণকার্য চলিতেছে। তন্মধ্যে ২৮টি গৃহের নির্মাণকার্য প্রায় সম্পূর্ণ। একটি সর্বজনীন দ্বিতল গৃহের নির্মাণকার্য শুরু করা হইয়াছে, বন্যার সময়ে উহা গ্রামবাসীদের আশ্রয়স্থানরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

বাংলাদেশে চিকিৎসা ও দুগ্ধবিতরণ যথাপূর্ব চলিতেছে।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

বেলঘরিয়ায় কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের দুইটি ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (সংস্কৃতে অনার্স) এবং এম. এস্‌সি. (ভূবিদ্যা) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

নরেন্দ্রপুর কলেজের তিনটি ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা (অনার্স), অঙ্ক (অনার্স) ও রসায়ন (অনার্স) পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্র চতুর্থ, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থান এবং রহড়া বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র দশম স্থান অধিকার করিয়াছে; পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ হইতে ৬৬টি ছাত্র পরীক্ষা দেয়, সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী কৃতানন্দ (ভাস্কর মহারাজ), গত ৬ই শ্রাবণ রাত্রি ২'৪৫ মি: (ইংরেজীমতে ২৩শে জুলাই ২'৪৫ মি: প্রাতে) মস্তিষ্ক-কাণ্ডে আঘাত পাওয়ার ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় ত্রিবান্দ্রামের একটি নার্সিং হোমে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৭ বৎসর। বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি রক্তচাপবৃদ্ধিজনিত অসুখে ভুগিতেছিলেন। গত ২৬শে জুন তিনি তিরুভল্লা আশ্রমে পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া যান। পরদিন প্রাতে তাঁহাকে ত্রিবান্দ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় ২৯শে জুন তাঁহাকে ত্রিবান্দ্রামের শ্রীচিত্র তিরুনাল মেডিক্যাল সেন্টারের বিশেষ যত্ন লইবার ওয়ার্ডে (intensive care ward) ভর্তি করা হয়। ৭ই জুলাই তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে জমাট-বাঁধা রক্ত বাহির করিবার জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়। ইহার ফলে প্রথম দিকে তাঁহার সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ২২শে জুলাই অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে।

তিনি ১৯৪৩ সালে সংঘের বিশাখাপটনম আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ সালে শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। যোগদানের কেন্দ্র ব্যতীত তিনি মরিশাস ও কালাডি কেন্দ্রে কাজ করেন। প্রায় দুই-দশককাল তিনি মরিশাস কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন।

স্বামী চিৎসুখানন্দ (পরিতোষ মহারাজ) হৃদ্‌যন্ত্রের অংশবিশেষে রক্তচলাচল বন্ধ হওয়ায় গত ১লা অগস্ট রাত্রি ১১-১০ মি: বেলুড় মঠে ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। গত কয়েকমাস যাবৎ তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। সেখানে

অস্ত্রোপচারের পর কিছুটা সুস্থ হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বিশ্রামের জন্য তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯৫০ সালে কলিকাতায় গদাধর আশ্রমে যোগ দেন এবং ১৯৫৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুকাল বাংলাদেশের ফরিদপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিন-বৎসরকাল বলরাম মন্দিরের ব্যবস্থাপনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি রাঁচি (মোরাবাদি), বোম্বাই, বারাণসী (সেবাশ্রম) ও পাটনা কেন্দ্রে এবং বেলুড় মঠেও কাজ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে তিনি সাড়ে ছয় বৎসর কাজ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত ৫ই নভেম্বর (১৯৭৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ৯ই নভেম্বর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল:

কথামৃত—

কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্টীমারে চলেছেন গঙ্গাবক্ষে। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য প্রসঙ্গ ব্রাহ্মভক্তেরা আনন্দের সঙ্গে শুনছেন। প্রসঙ্গ চলছিল তাঁরই চিত্র সম্পর্কে। গাজীপুরের পওহারী বাবা তাঁর ঘরে ঠাকুরের একখানি ছবি রেখেছেন; সেই কথা শুনে ঠাকুর বলেছেন—'খোলটা'!

সেই সূত্র ধরেই এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ। পওহারী বাবা সম্ভবতঃ ঠাকুরকে একজন মহাপুরুষ ব'লে ধারণা করেছিলেন, সেইজন্যই তাঁর ছবি নিজের ঘরে রেখেছিলেন। তিনি যে অবতার, মনে হয়, এ বুদ্ধি তাঁর হয়নি। তা যদি হ'ত, তাহলে নিশ্চয়ই দক্ষিণেশ্বরে আসতেন ঠাকুরকে দর্শন করতে, যেমন প্রাচ্য দেশের পণ্ডিতেরা ভগবান যীশুর আবির্ভাবের নিদর্শন দেখে তাঁকে দর্শন করতে বেথলেহেমে গিয়েছিলেন।

ভগবানের আবির্ভাব যা নাকি দুর্লভ ঘটনা, বহু যুগ পরে যা ঘটে, এবারে তাই ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরাবলম্বনে। সেই কথারই ইঙ্গিত দিচ্ছেন ঠাকুর দেহটা হচ্ছে 'খোল' অর্থাৎ আবরণমাত্র, আর তার ভেতরে রয়েছেন অবিনাশী-সচ্চিদানন্দ-পরব্রহ্ম। কিন্তু এখানে পূজনীয় মাষ্টারমশাই ঠাকুরের ঐ কথাটির ব্যাখ্যা যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করেছেন, সেটাকে আমি ঠিক সমর্থন করতে পারছি না। মাষ্টারমশাই লিখেছেন, 'দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর ক'রে কি হবে?' এইখানেই আমার আপত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ সাধারণ দেহ নয়। স্বয়ং পরব্রহ্মের লীলাবিগ্রহ এটি। তা যদি না হ'ত তাহলে ঠাকুর নিজেই তাঁর ছবিতে ফুল দিয়ে পূজা করতেন না—তাহলে তিনি নিজের ছবি দেখিয়ে কেনই বা বললেন, 'এ অতি উচ্চ অবস্থার ছবি,

কালে এ ছবির ঘরে ঘরে পূজো হবে।' সুতরাং ঠাকুর তাঁর ছবির পূজায় নিষেধ তো করেনই নি বরঞ্চ প্রচলনই ক'রে দিয়েছেন।

ঠাকুর বলছেন ভগবান সর্বত্র আছেন, তবে কোথাও কোথাও তাঁর বিশেষ প্রকাশ। গীতাতে আছে, 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'—'হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে রয়েছেন।' আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, তিনি সকল জীবের অন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। সেই কথাই ঠাকুর বলছেন: ভগবান সর্বত্র আছেন, তবে উপলব্ধিবান হৃদয়েই তাঁর বেশী প্রকাশ—আবার যে-সব ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে অধিরূঢ় তাঁদের অন্তরে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। ভক্ত ভগবান বৈ আর কিছু জানে না; ভগবানকে তন্ময় হয়ে ডাকার ফলে তিনি ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। ভগবান বিভু—সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে তিনি আছেন, কিন্তু তাঁর প্রিয় স্থান হচ্ছে ভক্তের হৃদয়। সেইটিই যেন তাঁর বৈঠকখানা, সেখানেই তিনি সহজলভ্য। এইটিই ঠাকুর তাঁর অনবদ্য উপমা দিয়ে বলেছেন, জমিদার যেমন তাঁর জমিদারির সর্বত্রই থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর বৈঠকখানায় তাঁর দর্শন সহজে পাওয়া যায়। এই ব'লে তিনি প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছেন।

আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন সমন্বয়াবতার। পূর্ব পূর্ব যুগের অবতারগণ শুধুমাত্র নিজের ধর্মমত প্রচারের দ্বারা সেই যুগের প্রয়োজনটুকুই মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ-যুগে সমগ্র বিশ্ব যেন একটা বিরাট আগ্নেয়-গিরির উপর বসে আছে, সেই অগ্নিগর্ভ পরিবেশ থেকে বিশ্ববাসীকে নিষ্কৃতির পথ দেখাতে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শ নিজ জীবন, সাধনা ও সিদ্ধির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে আমরা শুনতে পাচ্ছি তাঁর সেই অপূর্ব সমন্বয়ের বাণী—তিনি বলছেন, 'জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।' ঠিক এই সুরই আমরা শাস্ত্রেও শুনি—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অর্থাৎ যা অদ্বয় জ্ঞান, তাকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্বকেই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। মনে হয় ঠাকুর যেন শাস্ত্রপাঠ করেই ঐ কথা-গুলি বলেছেন। কিন্তু আমরা জানি, তিনি তা করেননি। এটি তাঁর নিজের অনুভূতির বাক্য প্রকাশ। তাই তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, 'মা রাশ ঠেলে দেন।' শব্দরাশি যোগান দিয়ে দেন মা জগদম্বা নিজেই। আমরা বুদ্ধির হিসেব মিলিয়ে অনেক কথা বলি। কিন্তু তিনি বিতরণ করছেন তাঁর অতিমানস হতে আহরিত জ্ঞান। সেটি প্রমাণীকৃত জ্ঞান। সেইজন্য পূর্বতন শাস্ত্রগ্রন্থে প্রকাশিত যে তত্ত্ব সেইটিই প্রায় একই ভাষায় তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত। শুধু শ্লোকের সঙ্গে তাঁর ভাষার যেটুকু সামান্য তফাত সেটি হচ্ছে—'যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে।' কিন্তু একটু পরেই দেখবো তিনি বলছেন, 'যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে।' অতএব এখানে তিনি আত্মা বলতে পরমাত্মাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। (১।২।৩)

গীতা—

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করতে বলেছেন। বলেছেন যে, কর্ম না করার চেয়ে কর্ম করাই ভাল, আর কর্ম না

করলে শরীররক্ষাও সম্ভব নয়। এখন বলছেন, যজ্ঞের কথা। আমাদের একটু আশ্চর্য মনে হ'তে পারে যে, যিনি কিছু আগে বৈদিক যজ্ঞাদিকর্মের প্রশস্তিকে পুষ্পিত বাক্য বলেছেন এবং অর্জুনকে ঐ সব ত্রিগুণাত্মক যাগযজ্ঞাদি সকাম কর্ম না করতেই বলেছেন, তিনিই আবার এখন সেই যজ্ঞানুষ্ঠান করতেই অর্জুনকে বলছেন। আমরা আগেই বলেছি গীতা হচ্ছে সমন্বয়-গ্রন্থ। এখানে ভগবান তৎকালে প্রচলিত চিন্তাধারার মধ্যে একটি সমন্বয় নিয়ে এসেছেন, 'যজ্ঞ' কথাটির যে অর্থ সেটিকে পরিবর্তিত করে দিয়ে। তিনি বলছেন, যজ্ঞ হচ্ছে সেইসব কর্ম যা ঈশ্বরের প্রীতির জন্য করা হয়। ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম না করলে সেটিই বন্ধনের কারণ হবে। অতএব ভগবানের প্রীতির জন্য অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে তিনি বলছেন। আচার্য শংকর এখানে বলছেন বৈদিক উদ্ধৃতি দিয়ে 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'—যজ্ঞই বিষ্ণু অর্থাৎ ঈশ্বর। শ্রীধরস্বামী বলছেন, 'তদর্থং—বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং'—বিষ্ণুর প্রীতির জন্য 'মুক্তসঙ্গঃ—নিষ্কামঃ সন্' নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে হবে। এইভাবে ভগবান 'যজ্ঞ' কথাটির একটি নূতন অর্থ দিলেন। কোন কিছুকে নস্যাৎ করে দেওয়া নয়। শুধু দৃষ্টিটাকে পালটিয়ে দিলেন। যজ্ঞ করার ধরনটিকে বদলিয়ে দিলেন—বললেন, নিষ্কাম হয়ে ভগবৎপ্রীতির জন্য কর্ম করো।

(৩৷৯)

কেন এই যজ্ঞাদি কর্ম করতে হবে সেই কথা বলছেন: একেবারে সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সঙ্গেই জীবদের সৃষ্টি করেছিলেন আর বলেছিলেন, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা সমৃদ্ধ হও এবং এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টদানে কামধেনুর সদৃশ হোক। বেদে নানারকম ফলপ্রদ—দর্শপূর্ণমাস গবালম্ভ অশ্বমেধ প্রভৃতি—বহুবিধ ভোগবাসনা-চরিতার্থকারী যজ্ঞের কথা আছে। মানুষকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে নিবৃত্ত ক'রে একটা উচ্চতর তৃপ্তির জন্য যজ্ঞীয় কর্মের বিধান সেখানে দেওয়া হয়েছে। সেই-কথাই ভগবান এখানে বলছেন, প্রজাপতি সৃষ্টির প্রথমেই মানুষের ভোগবাসনাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন। যজ্ঞীয় হবি ও দ্রব্যাদি নিজের ভোগের পূর্বে দেবতাকে আহুতি দেওয়ার বিধি সেইজন্যই। (৩৷১০)

আকাঙ্ক্ষিত ফল যজ্ঞের দ্বারা কিভাবে লাভ হবে তাই বলছেন: এইভাবে যজ্ঞের দ্বারা দেবতারা পরিতুষ্ট হ'লে তাঁরাও মর্ত্যের মানবদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন, অভীষ্ট ফল প্রদান করবেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত হ'লে অভিলষিত বৃষ্টি, স্ত্রী, পুত্র, পশু প্রভৃতি দান করবেন। যদিও আজকাল আমাদের বাংলা দেশে এই ধরনের বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রচলন নেই, তবু দেব-দেবীর পূজাদিতে আমরা যে অনুষ্ঠানাদি করি, তাও তাঁদের সন্তুষ্ট করে এবং তাঁরা আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। যাই হোক, এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়গত মানবজীবনকে ঊর্ধ্বায়িত করে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা, যাতে সেই শুদ্ধচিত্তে মুমুক্ষুতা জাগে। আচার্য শংকরও এই কথাই বলেছেন। তবে এর দ্বারাই চরমবস্তু লাভ হবে না। এটি চিত্তশুদ্ধির সহায়ক মাত্র। সেজন্য এই সকল মঙ্গলকর অনুষ্ঠান অবশ্যকরণীয়। (৩৷১১)

যজ্ঞের দ্বারা যা পাওয়া যায় সে-সবই দেবতাদের কৃপার দান—এটি জেনে সেগুলি একা-একা ভোগ না করে পুনরায় দেবতা, অতিথি, প্রভৃতি যাঁর যা প্রাপ্য তাঁকে সেটি

নিবেদন করা উচিত। পঞ্চমহাযজ্ঞ সেজন্য অবশ্যকরণীয়—শাস্ত্র একথা বলেছেন। এই-ভাবে দেবদত্ত বস্তুর সদ্ব্যয় যে না করে, তাকে চোর বলা হয়। আচার্য শংকর বলছেন, সে ব্যক্তি 'দেবাদিস্বাপহারী' অর্থাৎ দেবাদির নিজস্ব অপহরণকারী। (৩।১২)

তাহলে উপায় কি? কিভাবে চলতে হবে—সে কথায় ভগবান বলছেন: যজ্ঞাদিতে নিবেদিত দ্রব্যাদি যাঁরা প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করেন, তাঁদের আর 'দেবাদিস্বাপহারী' হ'তে হয় না। যারা পাপাত্মা শুধুমাত্র তারাই নিজের ভোগের জন্য রান্না করে। মনুস্মৃতিতে আছে, আমরা দৈনিক যে সব কাজ করি, তা করতে গিয়ে কিছু কিছু পাপ আমাদের হয়।—ঢেঁকি, জাঁতা, উনুন, জলের কলসী, ঝাঁটা—এই পাঁচটি ব্যবহারের সময়ে জীবহত্যা হয়, আর তাতে পাপ হয়। তবে শংকর বলছেন যজ্ঞাদিদ্বারা উৎসৃষ্ট অন্নাদি প্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করলে এই পঞ্চবিধ পাপ এবং প্রমাদকৃত হিংসাদিজনিত পাপ—সমস্ত পাপ থেকেও মুক্তি হয়। সুতরাং এখানে সাধারণ মানুষকে নিষ্কামভাবে কাজ করার জন্য ভগবান উৎসাহিত করছেন। শুধু আত্মতৃপ্তি নয়, পরার্থে সেবাই মানুষের জীবনাদর্শ হওয়া উচিত। যজ্ঞরূপ কর্মকাণ্ডকেও নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। (৩।১৩)

বিবিধ সংবাদ

আবির্ভাব-উৎসব

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা-সংসদে গত ২৭শে মার্চ হইতে ৫ই এপ্রিল ১৯৭৯, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ২৭শে সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ। ৩১শে প্রাতে পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা এবং লীলাগীতি হয়। মধ্যাহ্নে দুই হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পাঠের পর স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী অনন্তানন্দ। পরে রামায়ণগান করেন শ্রীবিজয়রাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১লা শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে স্বামী জিতাত্মানন্দ এবং ২রা ও ৪ঠা শ্রীমা সম্বন্ধে আলোচনা করেন যথাক্রমে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও স্বামী রমানন্দ। বিভিন্ন দিনে 'সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সম্মিলনী' কর্তৃক কালী কীর্তন, 'রাধারমণ কীর্তনসমাজ' কর্তৃক লীলাকীর্তন, 'রাধাদামোদর কীর্তনসমাজ' কর্তৃক কৃষ্ণ-কালী কীর্তন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংসদ' কর্তৃক 'ব্রহ্মময়ী' ও রামনাম-সংকীর্তন এবং কৃষ্ণা মিত্র, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরী-শ্রীমতী কর্তৃক ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

পরলোকে

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্র-শিষ্য রমণীকুমার দত্তগুপ্ত গত ১০ই অগস্ট ১৯৭৯, সন্ধ্যা ৭-১০ মিনিটে ৮৪ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও নিজ গুরুর পাবন-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

গত ২২শে জুন সিঁথির নিকটে সাইকেলের ধাক্কায় রাস্তায় পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার দক্ষিণ উরুর অস্থির উপরের অংশ ভাঙিয়া যায়। ৩রা জুলাই তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁহার অস্থিতে

অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের ফল সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু পরে প্রস্রাবের উপসর্গ ক্রমবর্ধমান হয় এবং রক্তে অত্যধিক ইউরিয়া দেখা দেয়। চিকিৎসার ফলে অবস্থার উন্নতি হইলে তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সিঁথির নিকটে তাঁহার ভাগিনেয়ের বাসভবনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাশীপুর রামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার হানারচর গ্রামে রমণীবাবুর জন্ম। চাঁদপুর টাউন স্কুল হইতে ১৯০৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হইতে আই. এ. এবং ঢাকা গভর্নমেণ্ট কলেজ হইতে তিনি বি. এ. পাস করেন। আইন পরীক্ষায় পাস করিয়া কিছুদিন ব্যবহারজীবীর কাজ করেন। কিন্তু পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, আইন ব্যবসা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। বলা বাহুল্য, ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষের সেই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অমোঘ।

১৯২২ সালে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে তিনি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের প্রথম দর্শন লাভ করেন। তদবধি আমৃত্যু তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯২৮ সালে বেলুড় মঠে তাঁহার দীক্ষা হয়। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

বিগত প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ তিনি উদ্বোধন কার্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি কাজ করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার প্রকাশনায় তাঁহার সহায়তা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থসমালোচনার অতিরিক্ত উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধের সংখ্যা ৬৫। অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকাতেও তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত। বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ' ও 'শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা' গ্রন্থদ্বয় তাঁহার রচনায় সমৃদ্ধ। ১৯৫৬ সালে উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আমৃত্যু তিনি উহার পরিচালকমণ্ডলীর মরমী সদস্য ছিলেন। ঐ সালে শিবানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সমিতি গঠিত হইলে তিনি উহার সম্পাদক হন। তিনি সুবক্তাও ছিলেন এবং ভাষণ, পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। গুরুগতপ্রাণতা, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, স্বাবলম্বন, অক্রোধ প্রভৃতি মহৎ গুণসমূহ তাঁহার চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল।

জীবনব্রতী

কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রে গত ৯ই জুলাই ১৯৭৯, ৬ জন কর্মীকে জীবনব্রতসাধনে দীক্ষিত করা হয়। ১৯৭৪-৭৫ সাল হইতে শিক্ষণপ্রাপ্ত এই সকল কর্মীদের মধ্যে এক মহিলাও আছেন। ইঁহারা জীবনব্রতী সংঘের দ্বিতীয় দল। দুইজন মহিলাসহ প্রথম দলটিতে ছিলেন ১১ জন; তাঁহারা দীক্ষিত হন গত বৎসরে।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা এই অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়। ভাবী জীবনব্রতীগণ যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে সরল পবিত্র ও নিয়মানুবর্তী জীবন যাপন এবং নিঃস্বার্থ সেবার আত্মোৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীএকনাথ রানাডে তাঁহাদের শপথবাক্য পাঠ করান। দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে জীবনব্রতীদের দশদিনব্যাপী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়।
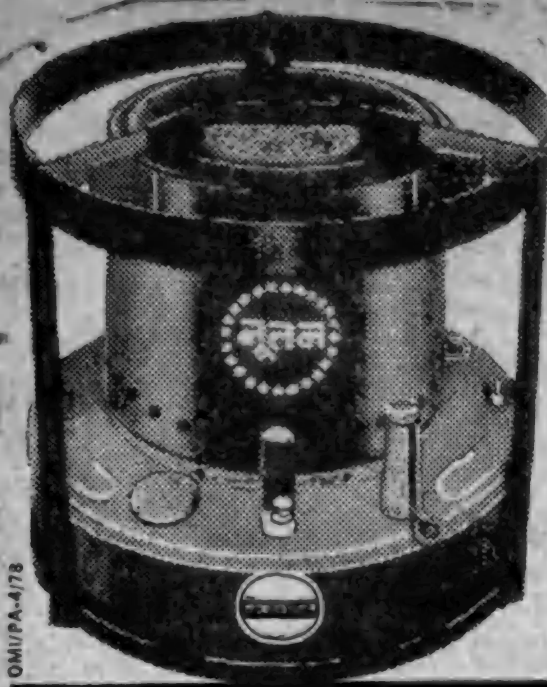
নূতন

কেরোসিন স্টোভ

কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে

ঘরে ঘরে এর আদর

কম তেলে অল্প খরচে
বহুদিন চলে

"নূতন" স্টোভ
কলকাতাতেই তৈরী।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশান লিঃ
দ্বারা লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা—
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ
কলকাতা-৭০০ ০১২

'বকলমা' মানে—মনে মনে ভগবানকে সমস্ত ভার অর্পণ করা। বকলমা দেওয়ার পরেও ইষ্টমন্ত্র জপ, কিংবা দিনান্তেও ভগবানকে একবার স্মরণ কর্ত্তে হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের সৌজন্যে

প্রচার হোক

এই বাণী

শ্রীপ্রদীপ দাস, শিবানন্দ কুটীর, বন্দোবস্তসড়ক, করিমগঞ্জ-৭৮৮৭১০

ওঁ তৎ সৎ

সারদা হীয়ারিং এড্ সেন্টার। ১/৩, ভুবন চ্যাটার্জ্জী লেন। (তারক প্রামানিক রোড) উত্তর কলিকাতা-৬। এখানে কানে শোনার মেসিন, কর্ড, ব্যাটারী ইত্যাদি বিক্রয় ও মেরামত করা হয়। শনিবার ও রবিবার সকাল ১০টা হইতে বৈকাল ৪টা এবং সোমবার হইতে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। অনুসন্ধান করুন। (তি-রতন ও শ্রীমানি বাজারের পশ্চিম দিকে এবং গিরিশ পার্ক ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত)

ট্রাম নং—১, ২, ৫ ও ৬ শ্যামবাজার বা ধর্মতলা হইতে শ্রীমানি বাজার।

বাস নং—২, ২বি, ৩২বি, ৭৮বি, ৪৩, ৪৩এ, ৩০এ এবং ৮বি।

Rollatainers Limited

13/6 MATHURA ROAD, FARIDABAD 121003, HARYANA

Manufacturers of "CEKA" Lined Cartons.

Pilferproof, hygienic and economical, 'Ceka' lined cartons offered by Rollatainers, is a complete pack suitable for many varied products that require packing and retailing.

Prefabricated 'Ceka' lined cartons are formed, filled and sealed in specially designed 'Ceka' packaging machines manufactured by Rollatainers. The construction of the pack is so designed that the product is delivered to the consumer through retail outlets, in factory fresh condition.

ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন

দেশী বিদেশী বহু কাগজের ভাণ্ডার

এইচ, কে, ঘোষ অ্যাণ্ড কোং

২৫এ, সোয়ালো লেন, কলিকাতা-১

টেলিফোন : ২২-৫২০১

নাম্বার টেন আপন জন

সুনীল দত্ত চিত্র সাংবাদিক বয়স ৩৭

ইনি আন্তর্জাতিক ইউনিসেফ এর জন্যে ছবি তোলার ভার পেয়েছেন।

Phone : Off. 66-2725
Resi. 66-3795

M/S. CHAKRABORTTY BROTHERS

BAMBOO & TIMBER MERCHANTS,

CONTRACTORS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

STOCKIST OF BAMBOO, SALBULLAH & HARD WOOD

PLANKS AND ALL KINDS OF SAL SIZES ETC.

Premier Supplier & Contractor of :

THE TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD.

STOCK-YARDS:–

1. **35, Khagendra Nath Ganguly Lane Howrah.**
2. **4A/1/1 Salkia School Road Howrah Rly. Yards**
3. **Shalimar B. F. Siding Plot Nos. 5 & 6**

Regd. Office :
119 Salkia School Road
Salkia, Howrah.

KOLAY

BISCUITS & SWEETS
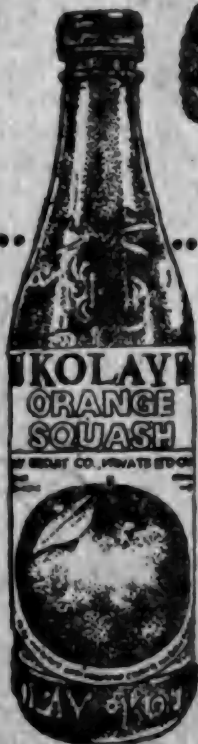
AND NEW INTRODUCTION

CONDIMENTS—
JAM, JELLY,
SAUCE, VINEGAR
AND SQUASHES

A PRODUCT OF
KOLAY BISCUIT
CO. PVT. LTD.
CALCUTTA-700 010

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—১৪৲ টাকা : পুরো সেট ১৩৫৲ টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র
দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত
তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান
চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে
পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গ
ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী
সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)
অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ
নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন
দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ— পৃঃ ১৪১, মূল্য ৩·৫০
ভক্তিযোগ— পৃঃ ৯৬, মূল্য ২·৮০
ভক্তি-রহস্য— পৃঃ ৯৮, মূল্য ৩·৪৫
জ্ঞানযোগ— পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০·৫০
রাজযোগ— পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫·৬০
সন্ন্যাসীর গীতি— পৃঃ ২৩, মূল্য ০·৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট— পৃঃ ২৯, মূল্য ০·৮০
সরল রাজযোগ— পৃঃ ৩৬, মূল্য ০·৫০
পত্রাবলী—প্রথমার্ধ— পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০·০০
শেষার্ধ— পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০·৫০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)—মূল্য ২৭·০০
ভারতীয় নারী— পৃঃ ৯৩, মূল্য ২·৪০
পওহারী বাবা— পৃঃ ১৮, মূল্য ০·৫০
স্বামীজীর আহ্বান— পৃঃ ৮০, মূল্য ০·৮০
ধর্ম-সমীক্ষা— পৃঃ ১৩০, মূল্য ২·৫০

বেদান্তের আলোকে— পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫·০০
ভারতে বিবেকানন্দ— পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০·০০
দেববাণী— পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬·৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ— পৃঃ ২৭৮, মূল্য ৪·০০
কথোপকথন— পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১·২৫
মদীয় আচার্যদেব— পৃঃ ৩২, মূল্য ১·৯০
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে— পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২·০০
চিকাগো বক্তৃতা— পৃঃ ৫২, মূল্য ১·৫০
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ— পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬·০০

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক— পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২·২৫
বর্তমান ভারত— পৃঃ ৪০, মূল্য ১·৬০
ভাববার কথা— পৃঃ ৬৪, মূল্য ২·৬০
বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭·০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ— স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই: মূল্য ১ম ভাগ ১৯·০০। ২য় ভাগ ১৭·০০

সাধারণ ১ম খণ্ড ৩·৫০। ২য় খণ্ড ৭·৮০; ৩য় খণ্ড ৫·২০; ৪র্থ খণ্ড ৭·০০; ৫ম খণ্ড ৭·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— অক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২১৬, সাধারণ ৬·০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭·০০

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৮, মূল্য ৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ১·২০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২·২০, বাঁধাই ২·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণবাণী—স্বামী অচ্যুতানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ৩১, মূল্য ১·০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭·০০, ২য় ভাগ ১০·০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৩, মূল্য ৬·০০

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ১৭·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩·০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬·০০; ২য় খণ্ড ১৬·০০; ৩য় খণ্ড ১৮·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪·২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২·৫০

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ দ্বিতীয় সং, মূল্য ২·৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ: স্বামী মাধবানন্দ)। মূল্য ৮·০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১·২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৪র্থ সং, মূল্য ৩·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২·৩০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ২য় ভাগ ২'৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

আরত্রিক-স্তব—মূল্য ০'৮০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংকেলিত "দ্রুতপাঠ" সংস্করণ—পৃঃ ৭২, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ— স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৪৪, মূল্য ১১'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪১৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১০৪, মূল্য ১'৫০

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৩৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০, ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—২০'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৭'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১'০০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১০, মূল্য ২'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'০০, বোর্ড বাঁধাই ৩'৫০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪'০০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'৫০

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ কালি লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

'রঘুনাথবিল্ডিংস'

৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন: ২৬-১০৫৫।৫৬

অন্যান্য শাখা : বারাণসী
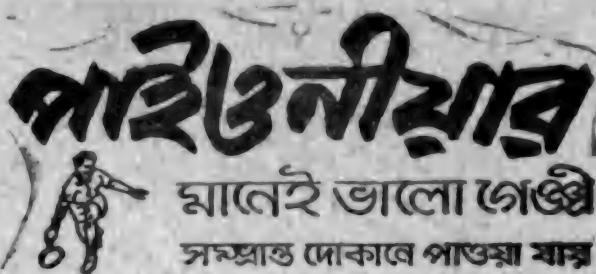
পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ, পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা-২

ফিউরাডান ৩জি

নিরাপদ, সিসটেমিক দানাদার কীটনাশক

বেগুনের মাজরা পোকা ও ধানের এবং আখের পোকা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে আদর্শ।

ফিউরাডান ৩জি হাতে নাড়াচাড়া করা নিরাপদ এবং জলে বা
দানার কোন গন্ধ থাকে না বা অবশিষ্ট পড়ে থাকে না।
বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় না...স্প্রে করা কীটনাশকের
চেয়ে বেশী সময় সুরক্ষিত থাকে।

র‍্যালিস ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ফার্টিলাইজার্স এ্যাণ্ড পেস্টিসাইডস ডিভিসন

১৬, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০১

এবার পূজায়

বাহির হইবে। বাহির হইবে।। বাহির হইবে।।!

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ

ছোটদের

বুক অব নলেজ

[বহু রঙিন চিত্র সম্বলিত—১০০০ পৃষ্ঠার বই]

দাম—টা. ৬০.০০

সোনার ঝাঁপি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাছাই করা ছোটদের গল্পের সংকলন। বড়দের লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ছোটদেরও যে তিনি মন জয় করতে পারেন, তার উজ্জ্বল প্রমাণ এই বইটি। হাসির গল্পে, ভূতের গল্পে ও অন্যান্য রোমাঞ্চকর গল্পে বইটি সমৃদ্ধ—যা ছোটরা কোন দিন ভুলতে পারবে না। তাছাড়া প্রচুর একরঙা ও রঙিন ছবিতে বইখানি সজ্জিত করা হয়েছে।

দাম—আট টাকা

কনক চাঁপা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নাম কে না জানে? বর্তমানে কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ প্রায় কেউই নেই। নানা অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী ও ডিটেকটিভ গল্পে বইটি পরিপূর্ণ। এর প্রতিটি গল্পই নিঃসন্দেহে ছোটদের মন জয় করবে। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে পাওয়া যাবে নারায়ণ দেবনাথের আঁকা বহু একরঙা ও তিনরঙা ছবি।

দাম—আট টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর ✻ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা।

প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।

—শ্রীসারদাদেবী

Sree Ma Trading Agency.

(COMMISSION AGENTS)

26, SHIBTALA STREET, CALCUTTA-700070.

With Best Compliments from :

Spritz Automation (India) Private Ltd.

140, ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD

CALCUTTA-25

Phone : 47-0985
48-2433

(SPECIALISTS IN PLASTIC MACHINERY)

প্রশ্ন—ঈশ্বর কোথা আছেন, তাঁকে কিরূপে পাওয়া যায় ?

উত্তর—সমুদ্রে রত্ন আছে যত্ন চাই। সংসারে ঈশ্বর আছেন সাধনা চাই।

বাউল যেমন দুহাতে দুরকম বাজনা বাজায় আর মুখে গান করে, হে সংসারী জীব! তুমিও হাতে কর্ম্ম কর, কিন্তু মুখে ঈশ্বরের নাম সর্ব্বদা ক'রতে ভুলোনা।

যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ী যাবার অনেক পথ আছে; সেইরকম ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে।

ঈশ্বরীয় কথার ইতি করা যায় না—পড়ুন।

৺সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও মিত্র ব্রাদার্স হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ

এই একমাত্র পুস্তকই ১৮৮৪ খৃঃ ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় মথুর, সুরেন্দ্রাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক ঠাকুরের নিকট পঠিত হইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং "শালা ঠিক ঠিক লিখেছে" বলিয়া হাস্য করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যত পুস্তক বাহির হইয়াছে ও হইতেছে তন্মধ্যে ইহাই আদি ও সর্ব্বপ্রথম পুস্তক।

প্রাপ্তিস্থান:—উদ্বোধন অফিস, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ (কামার পুকুর), শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির জয়রামবাটী, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বুকষ্টল ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

সুনিবিড় ছায়া ঘেরা তৃণ শস্যে ভরা,
বাঙলার পল্লী যেন মায়া দিয়ে গড়া।

কতগুলি পল্লী লয়ে গ্রামের রচনা,
তাহারই উন্নতি হোক মোদের কামনা।

পরমহংসের নাম শুনিয়াছ তুমি,
কামারপুকুর গ্রাম তাঁর জন্মভূমি।

এই মেঘ এই রোদ এই রং তুলি, এই ব্লক এই ছাপা, কেমনে তা ভুলি।

ফোন : ৩৪ ১৫৫২

রিপ্রোডাক্শন সিণ্ডিকেট

৭/১ বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

SUN LITHOGRAPHING CO.

PHOTO-OFFSET PRINTERS
&
PROCESS ENGRAVERS

★

P 20, C.I.T. ROAD
CALCUTTA 10
Phone : 352659

বাসনার লেশমাত্র থাকলে ভগবান লাভ হয় না। মন যখন বাসনারহিত হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

BISWAS & CO.

High Class Gold & Silver Stamping

and

General Order Suppliers.

74, BAITHAKKHANA ROAD, CALCUTTA-9

বোস ব্রাদার্স

শোরুম এণ্ড সিটি অফিস :
১২বি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-১
২২১/১, ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা-১
ফোন : ৩৪-৯১৪৭ ; ২২-৩৩৯৮

হেড অফিস, ওয়ার্কস এণ্ড কারখানা :
৭৬ বেনারস রোড, হাওড়া
ফোন : ৬৯-২২১৯ ; ৬৬-২১১০
৬৯-২৬৭০ ; ৬৬-২৯২৬

: ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ :

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী ৮.০০ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী ৮.০০

: ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য :

স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী ৮.০০ ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী ১৫.০০

: ঋষিদাস :

রামমোহন ৫.০০ শরৎচন্দ্র ১৫.০০ মাইকেল মধুসূদন ১৫.০০ বিদ্যাসাগর ১০.০০
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১০.০০ বাদশাখান ১০.০০ বিপ্লবী অরবিন্দ ৪.৫০

অমরনাথ রায়
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ৫.০০

পুরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী
রক্তে রাঙা জালিয়ানওয়ালাবাগ ৬.০০

অশোক প্রকাশন : এ, ৩২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ কুড়ি টাকা

গানের ভাবে-ও ঠাকুরের সমাধি হয়! ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় ১৮১ খানি গান কণ্ঠস্থ করেছিলেন। আর সেই-সব গান তিনি বিভিন্ন আলোচনায় একাধিকবার গাইতেন। শ্রীশ্রীমার ভাষায় তিনি গানে 'ভাসতেন'। কখনও আবার তাঁর গান স্বামীজীকেও ছাপিয়ে যেতো। তাঁর গান ভাব-প্রধান! তাই এতো হৃদয়স্পর্শী!

তিনি কোন্ গান কখন কী ভাবে পরিবেশন করতেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ গবেষণা করে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন।

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র

বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ

প্রথম খণ্ড-২০·০০ দ্বিতীয় খণ্ড-২০·০০ তৃতীয় খণ্ড-৩০·০০

অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-র

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ কুড়ি টাকা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র-র

সাধুসঙ্গ দশ টাকা

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ ॥ ফোন : ৩৪-৮৭৪৭

ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহের

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ (দুই খণ্ডে) ৩২·০০
ভগবৎ প্রসঙ্গ ১ম পর্যায় (২য় সং) ৮·০০
ভগবৎ প্রসঙ্গ ২য় পর্যায় ৩·০০
সন্ত তেরেসা ও পূর্ণতার সাধন ৩·০০
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা (৩য় সং) ২·০০

শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ সংকলিত

শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র রায় জন্মশতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ ... ৩·৫০

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত

স্তোত্র-মালিকা ... ১·০০

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাসের

সন্ধ্যামালতী (ভক্তিমূলক গ্রন্থ) ৩·০০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির—৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৬
মহেশ লাইব্রেরী—২১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, সারদা শিল্পপীঠ (বেলুড় মঠ), ও উদ্বোধন কার্যালয়।

Molin Electric Co.

217, BIDHAN SARANI
CALCUTTA-700006
Phone : 34-2509, 8049
Authorised PHILIPS Dealers & Govt. Licence Contractor.

"শিরদার তো সরদার, মাথা দিতে পারো তো নেতা হবে।"

ভারতাত্মার মূর্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দকে যিনি ভাব-গুরুরূপে গ্রহণ করে তাঁর অমোঘ বাণী নিজ জীবনে বহন করেছেন, সকল নেতার নেতা সেই নেতাজীর পূর্ণ জীবন-কাহিনী কার্টিজ কাগজে অফসেটে ছাপা বোর্ড বাঁধাই—

NETAJI A PICTORIAL BIOGRAPHY 50·00

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ বিবেকানন্দ চরিত ১৫·০০, ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০
প্রফুল্লকান্তি সরকার ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ ৬·০০, কল্কি হিন্দু ৪·০০
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ॥ রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা ৮·০০
সুভাষচন্দ্র বসু ॥ তরুণের স্বপ্ন ১০·০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ নিবেদিতা লোকমাতা ৪০·০০, আমাদের নিবেদিতা ৬·০০
সৌরীন্দ্র মিত্র ॥ খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে ৪০·০০
কিশলয় ঠাকুর ॥ পথের কবি ২০·০০
অম্লান দত্ত ॥ ব্যক্তি যুক্তি সমাজ ৫·০০
অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সূর্য পথিক শ্রীঅরবিন্দ ৮·০০
শান্তিদেব ঘোষ ॥ রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য ৫·০০
রাণী চন্দ ॥ পথে ঘাটে ১৫·০০
পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ মাধুরীলতার চিঠি ৫·০০
রাধারাণী দেবী ॥ শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প ১৫·০০
ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও মলয় দাশগুপ্ত ॥ ফুলের বাগান ২০·০০
শিবকালী ভট্টাচার্য্য ॥ চিরঞ্জীব বনৌষধি (৩ খণ্ডে) প্রতি খণ্ড ২৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫, বেনিয়াটোলা লেন ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ফোন : ৫৫-৩৪৬২

সাধুখাঁ এণ্ড কোং

৪৮ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা

(আর. জি. কর রোড জংসন্)

যাবতীয় ইমারতী রং, মোজাইক দ্রব্যাদি, এভারেষ্ট এসবেসটাস সীট ও পাইপ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

For good looks and long life
THE NAME TO REMEMBER ALWAYS IS
French Engineering Works
the sign of supremacy
TODAY

Manufacturers of
COLLAPSIBLE GATES
GRILLES, RAILINGS
M.S. GATES
STEEL WINDOWS
ROLLING SHUTTERS
ETC.

150, RASHBEHARI AVENUE,
CALCUTTA-29

TELEPHONE :
(2 Lines) HEAD OFFICE
46-7233, 46-2695
FACTORY : 117, Salimpur Road, CAL-31
42-2260

FRENCH
ENGINEERING
WORKS

মাছ যতদূরে থাক না, ভাল ভাল চার ফেলবামাত্রযেমন তারা ছুটে আসে, ভগবান্ হরিও সেইরূপ বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র এসে উদিত হন।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

বিজয় উড ইণ্ডাষ্ট্রীজ
টিম্বার মার্চেন্টস্, ম্যানুফ্যাকচারারস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স
ফোন : ৫৫-৪১৬৮
২৫।১, গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
শ্যামবাজার

শ্রীরামকৃষ্ণ শঙ্করানন্দ সেবাশ্রম

বামুনমুড়া, বারুইপুর, ২৪ পরগণা ৭৪৩২০২

নিবেদন

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের পত্রাবলী মুদ্রণের উদ্যোগ চলিতেছে। শীঘ্রই উহা প্রকাশিত হইবে। নিবেদন এই যে ভক্ত, গুণগ্রাহী ও সাধুগণের নিকট হইতে মহারাজজীর স্বহস্তলিখিত আরও কিছু পত্রাদি যদি অবিলম্বে পাওয়া যায় তবে ইহা সুন্দরতর হইবে। মূল পত্রাদি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে—নীলকান্ত মল্লিক, ১৯এ, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার, কলিকাতা ৭০০০০৯—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ইহা অবশ্যই রেজিস্টার্ড ডাকযোগে ফেরত পাঠান হইবে। সাধুগণের খরচ সেবাশ্রম হইতেই দেওয়া হইবে।

নিবেদক—নীলকান্ত মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

বারাসত আশ্রম প্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলি।

গ্রন্থগুলি প্রাপ্ত হয়ে—সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ সংকলককে লিখেছেন—"আপনার প্রেরিত বই তিনখানি—শ্রীরামকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রম্, শ্রীরামকৃষ্ণ-সহস্রনামার্চনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী—পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। সংস্কৃত ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবপ্রচারে বইগুলির অবদান অনস্বীকার্য। অন্বয়, শব্দার্থ ও অনুবাদাদি প্রাঞ্জল হওয়ায় বইগুলি সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইয়াছে। এই জাতীয় বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।"

১। শ্রীরামকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রম্—৪'০০
২। শ্রীরামকৃষ্ণসহস্রনামার্চনা—৩'০০
৩। শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী—৯'০০
৪। শ্রীরামকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রম্ (শ্রীরামকৃষ্ণসহস্রনামার্চনাসহিতম্) ৭'০০
৫। সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণরত্নস্তোত্রমালা—যন্ত্রস্থ

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্যালয়, কালচার ইনস্টিটিউট, বারাসত আশ্রম, বেলুড় সারদাপীঠ শো রুম, মহেশ লাইব্রেরী, বারাণসী সেবাশ্রম প্রভৃতি স্থান। —স্বামী অপূর্বানন্দ।

রামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি

শ্রীধ্রুব চৌধুরী

১ম খণ্ড ৬'০০, ২য় খণ্ড ৬'০০ (স্বরলিপি সহ)

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্যালয় ১, উদ্বোধন লেন, কলি-৩

বিভিন্ন পুস্তকের দোকানেও পাওয়া যাইবে।

Please Contact :—

FINE CHEMICAL PRODUCTS

44, EZRA STREET, (2nd Floor)
Calcutta-700001
Phone : 26-9104

For your requirements of :—

Laboratory and Industrial Chemicals
Laboratory Instruments etc.

ভারতের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রতিষ্ঠান

রাজজ্যোতিষী মহোপাধ্যায় ডাঃ ৺হরিশচন্দ্র শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠাতা ইয়োরোপ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যাগত ডঃ এ. ভট্টাচার্য শাস্ত্রী পরিচালিত। এখানে হস্তরেখা বিচার, কোষ্ঠী বিচার, কোষ্ঠী প্রস্তুত প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্যোতিষ-কার্য অর্ধশতাব্দী যাবৎ সঠিকভাবে করা হইতেছে, বিরূপ গ্রহ ও ভাগ্যের নিখুঁত প্রতিকার করা হয়।

ডঃ এ, ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী

হাউস অব এষ্ট্রোলজি (স্থাপিত—১৯৩০)
৪৫ এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-২৬, ফোন : ৪৭-৪৬৯৩
সহকারী তন্ত্রাচার্য অশেষ শাস্ত্রী

Balaram's

UNDERWEAR

'যার উপরে যেমন কর্ত্তব্য হাসিমুখে করে যাবে—জড়াবে না। একমাত্র ভগবানকে ছাড়া আর কাউকে ভালবেসো না—ভালবাসলেই দুঃখ। যদি শান্তি পেতে চাও তো কারো দোষ দেখো না—দোষ দেখবে নিজের।'

—শ্রীশ্রীমা

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচারিত হোক এই বাণী

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

CHICAGO ADDRESSES
Price : Re. 0·85

MY MASTER
Price : Re. 0·60

VEDANTA PHILOSOPHY
Price : Rs. 1·50

CHRIST THE MESSENGER
Price : Re. 0·80

SIX LESSONS ON RAJA YOGA (Tenth Edition)
Price : Rs. 1·50

RELIGION OF LOVE
Price : Rs. 3·50

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4·25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 3·00

THOUGHTS ON VEDANTA
Price : Rs. 1·50

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3·80

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
Price : Rs. 12·00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price Rs. 7.00

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6·00

AGGRESSIVE HINDUISM (Fifth Edition)
Price : Rs. 1·10

SIVA AND BUDDHA
Price : Re. 1·00

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7·50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER
COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
Cloth Rs. 2·30

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial)
By SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price : Rs. 2·50

MISCELLANEOUS BOOK

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price : Re. 0·70

UDBODHAN OFFICE 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003